
সেবা প্রকাশনী
মাসুদ রানা
তিন শত্রু
কাজী আনোয়ার হোসেন

তিন শত্রু

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ১৯৭৪

এক

সুন্দর রঙ!

ডিম্বাকৃতি কাঁচের জানালার পর্দাটা সরিয়েই মুগ্ধ হলো মাসুদ রানা। ছোট্ট লিভার চেপে সীটটা টিল্ট্ করে নিয়ে আরাম করে বসল হেলান দিয়ে। নিউজউইকটা পেটের উপর উপুড় করা।

চারদিক লালে লাল। লালেরই কত বাহার! কোথাও ফিকে হতে হতে গোলাপী, কোথাও সিঁদুরের মত টকটকে, কোথাও গাঢ় হতে হতে কালচে। উপরে, নিচে, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে। হঠাৎ করে মনে হয় চারদিকে আগুন জ্বলছে বুঝি।

ভয়ঙ্কর। এবং সুন্দর।

সাদা মেঘের গায়ে আবীর ছিটিয়ে অদৃশ্য হয়েছে সূর্যদেব।

মেঘ ফুঁড়ে নেমে এল বাংলাদেশ বিমান। নিচে এখন গঙ্গা। নৌকো, লঞ্চ, স্টীমার—বাচ্চাছেলের ছোটবড় খেলনা যেন সব, ছবির মত। হাওড়ার ব্রিজ পেরোচ্ছে একটা খেলনা ট্রেন।

গঙ্গার পুব তীরে কোলকাতা মহানগরী। ইডেন গার্ডেনের উপর এখন ওরা। তারপর ফোর্ট উইলিয়াম, গড়ের মাঠ, রেসকোর্সের উপর দিয়ে চক্কোর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব কোলকাতাটা দেখে নিয়ে চলেছে উত্তর দিকে। সাঁ সাঁ নেমে আসছে বাজপাখীর মত।

দমদম।

রানওয়েতে চাকা ঠেকতেই আরও জোরে গর্জে উঠল ইঞ্জিন। সীটবেল্ট খুলে প্রস্তুত হচ্ছে যাত্রীরা। জ্বলজ্বল করছে লাল হরফের নো স্মোকিং সাইন।

সবার সাথে নেমে এল রানা। সবাই কাস্টমসের হাত গলে বাইরে বেরোবার জন্যে ব্যগ্র। কেউ লক্ষ করছে না ওকে।

বাইরে বেরোতেই একগাল হাসিমুখে পথরোধ করল ইয়া এক শিখ। রানার লম্বা চুল, ভারী গোঁফ, আর ঠোঁট পর্যন্ত লম্বা পুরু জুলফি দেখেই ভক্তি এসে গেছে শিখ ড্রাইভারের। পাওয়া গেছে মাল। কড়ায় গণ্ডায় হিসেব করবার লোক এরা নয়।

নভেম্বর। সন্ধ্যা নামছে। আবছা কুয়াশার জাল।

ট্যাক্সিতে উঠে একটা সিগারেট ধরাল রানা। বলল, 'হোটেল খাসমহল।'

ভুরু কুঁচকে উঠল শিখ ড্রাইভারের। গাবার্ডিনের সাদা স্যুট, দামী টাই, চকচকে হাই-হিল জুতো দেখে ভেবেছিল সেরা কোন হোটেলে উঠবে বাবু।

হোটেলের নাম শুনে বেশ খানিকটা দমে গেছে মন—বকশিশ মিলবে না বোধহয়। নিজের কপালকে গোটা দুয়েক পাঞ্জাবী গালি দিয়ে মন দিল গাড়ি চালনায়।

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে ছুটছে ট্যাক্সি। সন্ধ্যা নামতেই সেজে বসেছে মহানগরী। সারি সারি দোকানে নিয়ন বাতির চোখ ধাঁধানো আলো। অসংখ্য নারী-পুরুষ কেনাকাটা করছে। ফুটপাথে হকাররা সাজিয়ে বসেছে হরেক রকম জিনিস। প্রচণ্ড ভিড়। লোকে লোকারণ্য। হাড় জিরজিরে অভুক্ত উলঙ্গ বাচ্চারা সুবেশ বাবুদের পিছন পিছন হাঁটছে পয়সার জন্যে। এখানে সেখানে দেখা যাচ্ছে বাস্তুহারা ছিন্নমূল মানুষের শুকনো মুখ। ফুটপাথেই তারা সংসার পেতেছে। প্রাচুর্য ও অভাবের এমন দৃশ্য এশিয়ার অনেক শহরেই দেখেছে রানা। এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেও প্রায়ই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মন। সেই চিরন্তন প্রশ্ন মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে : কেন একশ্রেণীর লোক প্রয়োজনের চেয়ে লাখোগুণ, কোটিগুণ বেশি সুযোগ-সুবিধে ভোগ করবে, আর একশ্রেণীর মানুষ না খেতে পেয়ে সবার চোখের সামনে ধুঁকে ধুঁকে তিলে তিলে মরবে? আমূল পরিবর্তন ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। সবাই বলে একথা। সবাই জানে। পরিবর্তন আসবেই। কিন্তু কবে?

রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল রানা। পিছনেই একটা ট্যাক্সি দেখা যাচ্ছে। দু'জন মাড়োয়ারী পিছনের সীটে বসে হাসছে, গল্প করছে। ট্যাক্সির পিছনে একটা এ্যামব্যাসাডার। ব্যাক সীটে দুটো মেয়ে শুধু।

বাম বাহু চেপে বগলের নিচে হোলস্টারে রাখা ওয়ালথার পি. পি. কে-র স্পর্শ নিল রানা। টান দিল সিগারেটে। মোড় নিচ্ছে ট্যাক্সি।

হ্যারিসন রোড অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী রোড। সিকি মাইল এগিয়ে থামল ট্যাক্সি। মিটারে কত উঠেছে দেখল না রানা। দশ টাকার একটা নোট ড্রাইভারের হাতে ধরিয়ে দ্রুত পা ফেলে এগোল হোটেলের দরজার দিকে। রানা দেখতে পেল না, খুশি মনে স্যালিউট ঠুকল শিখ ড্রাইভার।

কাঠা তিনেক জমিতে ছয়তলা উঁচু হোটেল খাসমহল। বহুদিনের পুরানো বিল্ডিং। বিগড়ে গেছে চেহারা। সুইং-ডোর ঠেলে ভেতরে ঢোকার সময় বুঝতে পারল রানা এটা নতুন সংযোজন। রানা ঢুকতেই একটা চেয়ার সরাবার শব্দ হলো। লবিতে একেবারেই ভিড় নেই। রেজিস্ট্রেশন ডেস্কে একজন বুড়ো লোক বসে আনন্দবাজার পড়ছে।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বুড়ো ম্যানেজার মুখ তুলল। কথা বলার আগে গলাটা পরিষ্কার করে নিল কেশে। তোবড়ান গাল, খয়েরী রঙের মাড়ী। মোটমাট তিনটে দাঁত—উপরে দুটো, নিচে একটা। তিনটেই নড়বড়ে।

'স্বাগতম! নিবেদন করুন?'

চোখের দিকে তাকিয়ে রানা টের পেল ঠাট্টা করছে না, খুব সম্ভব এভাবেই কথা বলে বুড়ো।

'ঢাকা থেকে দু'দিন আগে কেব্‌ল্ করেছিলাম,' বলল রানা। 'রিজার্ভেশনের জন্যে।'

'স্বাগতম!' খিটখিটে দেহটাকে চেয়ার থেকে টেনে হিঁচড়ে তুলে খাড়া করল বুড়ো। কুঁচকে উঠল গালের ঢিলেঢালা চামড়া, খুব যেন ব্যথা পেয়েছে কোথাও। একটা হাত কোমরে রাখল। মুখ বিকৃত করে চাইল রানার দিকে. 'আশি প্রকার ব্যামোয় জর্জরিত, স্যার। বর্তমানে ভুগছি বাতে। বাংলাদেশ থেকে আগত শ্রী রাশেদুজ্জামান খান, নয় কি?' সবজান্তার মত ঘন ঘন মাথা নাড়ল কয়েকবার। 'এই অধীন সম্মানীয় অতিথির জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ কক্ষের ব্যবস্থা করে রেখেছে। নম্বরটা হলো গিয়ে সাতাশ। দ্বিতলে অবস্থিত।'

বুড়োর কথা শুনছিল না রানা। এদিক ওদিক চোখ ঘুরিয়ে চারিটা দিক দেখছিল ও। কেন যেন মনে হচ্ছে, কেউ লক্ষ্য করছে ওকে।

বুড়ো থামতে রানা বলল, 'কিন্তু কেবলে আমি আটষট্টি নম্বর কামরার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। যুদ্ধের সময় ওই রুমে কয়েক দিন ছিলাম আমি।'

'মাননীয় অতিথি কি মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন?'

'হ্যাঁ। আগরতলায় আমাদের ক্যাম্প ছিল। ছুটি নিয়ে বেড়াতে এসেছিলাম কোলকাতায়। তখন যে ঘরে ছিলাম সেই ঘরটাতেই থাকতে চাই আমি।'

'স্যার কি ক্ষমা করবেন না?' বুড়ো নাটুকে ভঙ্গিতে মুখটা সামনে বাড়িয়ে পকেট থেকে চার মিনারের প্যাকেট বের করে রানার সামনে ধরল. 'একটা গ্রহণ করলে কৃতার্থ হব। আপনার মনোবাঞ্ছা বর্তমানে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না বলে দুঃখিত, স্যার। আটষট্টি নম্বর কক্ষে এক বাবু স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে হাট বসিয়েছেন।' বুড়ো এদিক ওদিক চাইল। গলা খাঁকারী দিল। 'হনুমানটা গেল কোথায়? স্যারকে পৌঁছে দিতে হয় যে।' হঠাৎ হাঁটু ভেঙে চেয়ারে বসতে গিয়ে চোখ মুখ কুঁচকে কোমরে হাত দিল, 'উহ্! আশি প্রকার ব্যামোয়...'

রানা দেখল বুড়ো একটা বেলের সুইচ টিপে ধরেছে। বহুদূরে বাজছে বেল।

'আটষট্টি নম্বরে যারা আছেন তারা থাকছেন ক'দিন?'

'গত সপ্তায় বিদায় নেবার পাকা কথা ছিল। এখন ভগবান জানেন।'

রানা সিগারেট বের করে ধরাল। সাবধানে জিজ্ঞেস করল, 'তিন বছর আগে কি আপনাকে এই হোটেলে...'

'না। আমাকে দেখেননি। বছর খানেক হলো এ হোটেলে আমার আবির্ভাব হয়েছে। আগে ছিলাম...'

'যুদ্ধের সময় থেকে কাজ করছে এমন লোক আপনাদের স্টাফের মধ্যে দু'একজন আছে নিশ্চয়?'

'বিলক্ষণ।' বুড়ো ম্যানেজার রানার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে এদিক ওদিক তাকাল। বিরক্তির রেখা ফুটল চোখেমুখে। 'সুধীর বাবু আবার কোথায় গেল? এই মাত্র না দেখলুম? সুধীর বাবু!' বুড়ো হাঁক ছাড়ল। 'সুধীর বাবু!'

পাঁচ-সাতবার গলা ছেড়ে হাঁক ছাড়তে ভিতরের দরজা দিয়ে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের একজন ফুলপ্যান্ট-হাওয়াই শার্ট পরা লোক মাথা নিচু করে

লবিতে ঢুকল। রানা সুইং-ডোর ঠেলে ভেতরে ঢোকার প্রায় সাথে সাথে এই লোকটা চেয়ার সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। তখন বিশেষ মনোযোগ দেয়নি রানা। লোকটা কখন বেরিয়ে গিয়েছিল লক্ষ করেনি ও।

ডেস্কের সামনে দাঁড়াল লোকটা।

'ইনি আমাদের অতিথি,' ম্যানেজার বলল, 'বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে আগত।' রানার দিকে ফিরে হাসল। 'সুধীর বাবু পাঁচ বছরের পুরানো স্টাফ।'

'নমস্কার।' ম্লান হেসে চোখ তুলে তাকাল সুধীর। রানার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড মাত্র দৃষ্টি রেখে নামিয়ে নিল চোখ। তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। কি যেন খুঁজল লোকটা রানার মুখের দিকে তাকিয়ে।

'একাত্তরে এখানে ছিলেন তাহলে আপনি!' রানা বলল, 'আমাকে চিনতে পারছেন?'

'যুদ্ধের সময়, স্যার কি এখানে ছিলেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল সুধীর। এবারও কয়েক সেকেন্ডের জন্য তাকাল। সেই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি।

'অক্টোবরের ছয় তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত। পাঁচদিন।'

'না, স্যার।' শান্ত গলা সুধীরের। 'চিনতে পারছি না। হয়তো ছুটিতে ছিলাম তখন। মনে নেই।'

চোখ না তুলে উত্তর দিল সুধীর। আপাদমস্তক লক্ষ করল রানা লোকটার। ডান পায়ের উপর বাঁ পা ঘষছে।

'আমার নাম রাশেদ। রাশেদুজ্জামান খান।'

একটু যেন কেঁপে উঠল সুধীরের চোখ দুটো। চোখের ভুলও হতে পারে। চোখ তুলে এবার রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কই না! নামটাও পরিচিত বলে মনে হচ্ছে না।'

'এই ব্যাটা হনুমান!' ম্যানেজার হঠাৎ ডেস্কে চাপড় মেরে গর্জে উঠল। 'দু'মিনিট পর পর বিড়ি খেতে না গেলে চলে না? এমন এক লাত মারব, পোঁদ ফেটে মরবি! এদিকে আয় ব্যাটা পাজী, শয়তান!'

অস্বাভাবিক লম্বা খিটখিটে রোগা একজন লোক দাঁত বের করে হাসতে হাসতে কাছে এসে দাঁড়াল।

'এই যে সাতাশ নম্বর কক্ষের চাবি। মাননীয় অতিথিকে পথ দেখিয়ে ওপরে নিয়ে যা।'

হনুমান কোদালের মত বড় বড় দাঁত বের করে হাসল। তুলে নিল ডেস্ক থেকে রানার ব্যাগটা। 'চ-চ-লুন, স্য-স্যার।' লিফটের দিকে পা বাড়াল তোতলা হনুমান।

রানা ম্যানেজারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আটষট্টি খালি হলে আমি সাতাশ ছেড়ে দেব। ভুলবেন না কথাটা।'

সবিনয়ে বুড়ো বলল, 'কেন লজ্জা দিচ্ছেন, স্যার। অতিথির কথা ভুলে থাকা কি সম্ভব?'

হনুমানকে অনুসরণ করল রানা। পিছন থেকে একটা কাতর ধ্বনি ভেসে এল। তারপর শোনা গেল, 'উহ্! প্রপিতামহ! মরে গেলুম। আশি প্রকার

ব্যামোয়…'

লিফটটা নড়বড়ে। রানার ভয় হতে লাগল ভেঙে পড়ে যাবে না তো? হনুমানের বিশ্রী একটা স্বভাব দাঁত বের করে থাকা। পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়স হবে। গাল ভেঙে চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে এরই মধ্যে। সরাসরি না তাকিয়েও রানা বুঝতে পারল ওর কোটের বোতাম গুনছে লোকটা বিড় বিড় করে।

লিফট থামতে করিডরে নামল রানা। কোন এক কামরা থেকে নারী কণ্ঠের রিনরিনে হাসি ভেসে এল, প্রাণখোলা। লম্বা পা ফেলে রানাকে ছাড়িয়ে গেল হনুমান। বাম পাশে সিঁড়ি। পাশ দিয়ে যাবার সময় কি মনে করে নিচের দিকে তাকাল রানা।

চোখাচোখি হয়ে গেল সুধীরের সাথে। লাউঞ্জে দাঁড়িয়ে সোজা চেয়ে রয়েছে উপর দিকে। রানাকে আর একনজর দেখবে বলে। এত কৌতূহল কেন? চিনতে পেরেছে লোকটা রাশেদকে?

চোখাচোখি হতেই ঘুরে দাঁড়াল সুধীর।

সাতাশ নম্বরের তালা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল হনুমান। ভিতরে ঢুকল রানা। ছোট হলেও ঘরটা বেশ পছন্দ হলো ওর। তারপরই চোখ পড়ল ব্যালকনিতে। দরজা পেরিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল ও।

রাস্তা দেখা যাচ্ছে। নিচে একচিলতে বাগান। কেউ নেই বাগানে। কি যেন বিড় বিড় করে বলছে হনুমান।

বাগানের দুই প্রান্তে দুটো লম্বা নিওন বাতি। রাশেদের চিঠিতে এই বাগানের উল্লেখ আছে মনে পড়ল রানার।

ঘরে ফেরার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও আবার নিচের দিকে তাকাল রানা।

ভাল করে দেখা যাচ্ছে না লোকটাকে। মুখে একটা সিগারেট জ্বলছে। মাথা পিছনে হেলিয়ে চেয়ে আছে উপর দিকে। রানা তাকাতেই দু'পা সরে গিয়ে গা ঢাকা দিল।

কে লোকটা? সুধীর? ঠিক চেনা গেল না।

ঘরে ঢুকে রানা দেখল হনুমান চলে গেছে। দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিয়ে বিছানায় বসল ব্যাগটা নিয়ে। ট্রাউজার আর শার্টগুলো বের করে ওয়ারড্রোবে ঝুলিয়ে রাখল। বাথরুমের দরজাটা খুলে ভিতরটা দেখে নিল একবার।

বিছানায় ফিরে এসে সিগারেট ধরাল একটা। জুতো না খুলেই লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। আগামীকাল সকাল থেকে কাজ শুরু করবে ও। কিন্তু…দূরছাই! কোত্থেকে শুরু করবে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না যে।

রাহাত খানের মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। ঠিকই বলেছিলেন মেজর জেনারেল।

'তোমার এবারের অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মত।' মেজর জেনারেল পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলছিলেন, 'এই দুটো কাগজে যা আছে তার বেশি সংগ্রহ করা যায়নি।' ফাইল থেকে দুটো

ফুলসক্যাপ শীট বের করলেন। 'রাশেদুজ্জামান খান বলে একজন মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে যা যা জানা গেছে তা সবই লেখা আছে এই প্রথম কাগজটায়। দ্বিতীয়টায় সন তারিখ এবং কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে। এছাড়া একটা ফটো পাবে তুমি।'

মেজর জেনারেলকে থ্রী নান্স্ ভরে নিয়ে পাইপে অগ্নিসংযোগ করতে দেখে নড়েচড়ে একটু আরাম করে বসল রানা।

'যুবকটি সম্পর্কে জানা দরকার তোমার।' নীলচে ধোঁয়া বেরুচ্ছে পাইপের মুখ দিয়ে। 'মারা গেছে সে। বাবা-মার একমাত্র সন্তান। বড় একটা ভাই ছিল কিন্তু পাঁচ বছর বয়সে পুকুরে ডুবে মারা যায়। রাজশাহীতে জন্ম রাশেদের। বাবা-মা দুজনেই জীবিত। বিরাট এক বড়লোকের খেতখামার, পুকুর বাগান দেখাশোনা করে রাশেদের বাবা। একনম্বর কাগজটায় পাবে তুমি রাশেদের ছোটবেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর বিবরণ।' মেজর জেনারেল হাতের একনম্বর কাগজটায় চোখ বুলিয়ে নিলেন।

অনুমান করার চেষ্টা করছে রানা অ্যাসাইনমেন্টের প্রকৃতিটা।

'আর্ট কলেজে ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র ছিল রাশেদ। জুন মাসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। ফ্রগম্যান হিসেবে খুব নাম করেছিল ছেলেটা। বেশির ভাগ সময় কাটে আগরতলায় ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে। তবে অক্টোবরে সাতদিনের ছুটি নিয়ে কোলকাতায় যায় সে। সেখানে থাকে মাত্র পাঁচ দিন। কাজে ফিরে যোগ দেয়ার দিনই একদল মুক্তিযোদ্ধার সাথে পাঠানো হয় তাকে মেঘনায় খান সেনাদের একটা স্টীমার ডুবিয়ে দেয়ার অপারেশনে। মাঝপথে পাকবাহিনীর পাতা ফাঁদে পড়ে প্রাণ দেয় সদলবলে রাশেদ।'

হঠাৎ ডাক পেয়ে ছলকে উঠেছিল রানার বুকের রক্ত, কিন্তু বুড়োর সাদামাঠা বর্ণনায় মন খারাপ হয়ে গেল ওর। এরই জন্যে এত জরুরী তলব? মুক্তিযোদ্ধার করুণ কাহিনী?

'কোন মানুষের জীবনের ঘটনাই পুরোপুরি সাধারণ নয়,' রানার মনের ভাব টের পেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন মেজর জেনারেল। 'রাশেদের ছোট্ট জীবনে অসাধারণ ঘটনা একবার নয়, দু'দু'বার ঘটেছিল।'

নড়েচড়ে বসল রানা। আসল কথায় আসছে বুড়ো এতক্ষণে। কাগজে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন মেজর জেনারেল।

'প্রথম ঘটনা। তারিখ, উনিশশো একাত্তর সালের অক্টোবর মাস—অক্টোবর দুই। স্থান, গভীর বঙ্গোপসাগরে ভাসমান একটা পাকিস্তানী পণ্যবাহী জাহাজ। সময়, রাত বারোটা। পাত্র-পাত্রী, রাশেদ এবং তার তিনজন সহকর্মী যোদ্ধা। পরিকল্পনা মত ইঞ্জিনরুমে ডিনামাইট ফিট করে রাশেদ এবং তার বন্ধুরা নাবিকদের চোখে ধুলো দিয়ে একটা বোটে এসে নামে। অপারেশন সাকসেসফুল। পনেরো মিনিট পর ডিনামাইট ফাটে এবং জাহাজটা সাতশো আহত খানসেনা এবং বোঝাই পণ্য নিয়ে ডুবে যায়। কিন্তু সাগরের স্রোতের সাথে যুদ্ধ করে হেরে যায় রাশেদরা। দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে বত্রিশ ঘণ্টা পর ওদের বোট গিয়ে ঠেকে শেষ পর্যন্ত সন্দ্বীপে।'

কৌতূহল হারিয়ে ফেলেছিল রানা। ঘটনার কোথাও কোন রহস্য নেই, চমৎকারিত্ব নেই।

'ক্লান্ত অবসন্ন তখন ওরা। তীরেই বালির ওপর গা এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঠিক যখন সাড়ে চারটে বাজে তখন সমুদ্রের দিকে চেয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল রাশেদ—কামাল মারা গেল।'

'কামাল মারা গেল মানে?' নিজের অজান্তেই প্রশ্ন করল রানা।

মেজর জেনারেল রানার প্রশ্ন যেন শুনতে পাননি। পাইপে টান দিয়ে ধুঁয়ো ছেড়ে বলে যেতে লাগলেন, 'সবাই তখন ঘুমে অচেতন। ক্ষিধে আর অবসাদে এতই কাহিল, ঠেলে ধাক্কেও জাগাতে পারল না রাশেদ ওদের। দূর সমুদ্রে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল সে। অনেকক্ষণ ধরে জ্বলল আগুনটা। তারপর একসময় নিভে গেল। আকাশে তখনও জ্বলছে অসংখ্য তারা। ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপন মনেই বিড়বিড় করল রাশেদ, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন।'

রানা বলল, 'তার মানে বঙ্গোপসাগরে আরও একটা পাকিস্তানী জাহাজ ডুবিয়ে দিল কামাল নামে ওদের একজন বন্ধু। সুইসাইড স্কোয়াডের ছেলে এই কামাল।'

মেজর জেনারেল ভুরু কুঁচকে নিভে যাওয়া পাইপটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইলেন। তারপর লাইটার জ্বেলে ধরালেন আবার। 'অক্টোবরের চার তারিখে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা চারজন। দুপুরের মধ্যেই চারদিকে রটে গেল কামালের মহান আত্মত্যাগের কথা। প্রত্যক্ষদর্শী রাশেদের কাছে এল সবাই ঘটনাটা শুনতে। বিকেল নাগাদ কারও জানতে বাকী রইল না এবং সন্ধ্যার সময় রাশেদের ডাক পড়ল মেজর বাশারের তাঁবুতে।' এক আঙুলে নাক চুলকালেন মেজর জেনারেল।

'মেজর বাশারের অধীনে কাজ করত রাশেদ। মেজর খুবই ভালবাসত রাশেদকে। রাশেদের মুখ থেকে ঘটনাটা আর একবার শুনল সে। তারপর প্রশ্ন করল—সন্দ্বীপ থেকে ঠিক কতখানি দূরে আগুন জ্বলতে দেখেছ ঠিক ঠিক বলতে পারবে রাশেদ? রাশেদ মাথা নাড়ল—পারব, স্যার। মেজর জানতে চাইল—আগুন যেখানে জ্বলছিল তার উপরে, বাঁয়ে, ডাইনে কি কি নক্ষত্র বা গ্রহ তখন ছিল মনে করতে পারো? রাশেদ আবার মাথা নাড়ল—পরিষ্কার ভাসছে গোটা দৃশ্যটা চোখের সামনে, স্যার। কিন্তু আপনি এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন? মেজর বলল—তুমি বসো। আমি ন্যাভাল লেফটেন্যান্ট আহসানকে ডেকে পাঠাচ্ছি। তার আগে বলো দেখি—যখন আগুন জ্বলছিল তখন ঘড়ি দেখেছিলে কি না? রাশেদ জানাল—ঠিক সাড়ে চারটের সময় আগুন দেখি আমি। মেজর বাশার বলল—একটা জাহাজকে যখন ডুবিয়ে দেয়া হয় তখন কোথায় সেটা ডুবল তার রেকর্ড রাখা নেভীর একটা দায়িত্ব। কিন্তু এক্ষেত্রে তেমন সুযোগ ছিল না। কামাল নিজের জীবন দিয়ে জাহাজটাকে ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েই গিয়েছিল। ভাগ্য খুবই ভাল যে তুমি ঘটনাটা চাক্ষুষ করেছ, যাক, ঠিক কোথায় আগুন দেখেছ, কোথায় নক্ষত্রগুলো ছিল

নিখুঁতভাবে যদি বলতে পারো দারুণ কাজ হবে।'

'মেজরের আগ্রহ কেন এত? কি কার্গো ছিল জাহাজটায়?' জানতে চাইল রানা।

'কি কার্গো ছিল তা মেজর তখনও বলেনি রাশেদকে। কার্গো সম্পর্কে এতটুকু আভাস পেলে ম্যাপটা আঁকার ব্যাপারে হয়তো লেফটেন্যান্টকে আন্তরিক সাহায্য করত না সে। লেফটেন্যান্ট আহসান যন্ত্রপাতি আর স্কেল নিয়ে কাগজে বিষুব রেখা, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ টানল। অক্টোবরের দুই তারিখে রাত সাড়ে চারটের সময় কি কি নক্ষত্র কোথায় কোথায় থাকার কথা চার্ট খুঁজে বের করে কাগজে একটা একটা করে আঁকল। তারপর রাশেদের কথামত দূরত্ব আন্দাজ করে নির্দিষ্ট জায়গাটা চিহ্নিত করল একটা বিন্দু এঁকে। মহাখুশি হয়ে উঠল মেজর বাশার। নক্সাটা রেখে দিল যত্ন করে। রাতের খাবারটা তার সাথে খাওয়ার অনুরোধ করল রাশেদকে।'

মেজর জেনারেল থামলেন। রানা প্রশ্ন করল, 'তারপর?'

'খাওয়া-দাওয়ার পর উঠি উঠি করছিল লেফটেন্যান্ট আহসান ও রাশেদ, ইঙ্গিতে ওদের বসতে বলে তাঁবুর চারপাশটা দেখে এল একবার মেজর বাশার। তারপর বলল—একটা অদ্ভুত অনুরোধ করব তোমাদের। এই নক্সাটার কথা বেমালুম চেপে যেতে হবে, ঘুণাক্ষরেও যেন কেউ টের না পায় যে নক্সা এঁকেছি আমরা। অবাক হয়ে রাশেদ জিজ্ঞেস করল—কেন, স্যার? মেজর বাশার ও লেফটেন্যান্ট আহসান চোখ চাওয়া চাওয়ি করে মুচকে হাসল, তারপর রাশেদকে আরও কাছে ডেকে এনে ফিসফিস করে বলল—জাহাজটায় কি ছিল জানো? সোনা! বাংলাদেশের সোনা চলে যাচ্ছিল করাচীতে!'

'সোনা!' সিধে হয়ে বসল রানা। এবার ঘন হয়ে আসছে ব্যাপারটা। 'পরিমাণ?'

'ঠিক জানা যায়নি। আমাদের অনুমান—টু অ্যান্ড এ হাফ টন্স্!' মৃদু হেসে বললেন মেজর জেনারেল। 'আড়াই টন সোনা ছিল জাহাজটায়।'

'উদ্ধার করার চেষ্টা হয়নি?'

'না। কারণটা বলছি।' আবার পাইপে তামাক ভরলেন বৃদ্ধ, ধরিয়ে নিয়ে ভুকভুক করে সুগন্ধি ধোঁয়া ছাড়লেন। জিভে জল এসে গেল রানার, ঢোক গিলল। সোজা চাইলেন মেজর জেনারেল রানার চোখে। 'অবাক হয়ে গেল রাশেদ। জিজ্ঞেস করল—এত ঢাকঢাক গুড়গুড় কিসের? উত্তরে মেজর বলল—আমরা তুলতে চাই এ সোনা। স্বাধীনতার পর। আমরা চাই, বাংলাদেশের সোনা তুলবে বাংলাদেশ, আর কোন রাষ্ট্র নয়।

'ব্যাপারটা বুঝতে পারল রাশেদ। ইঙ্গিতটাও বুঝল। তবু আরও একটু পরিষ্কার হওয়ার জন্যে বলল—তার মানে, আশঙ্কা করছেন, আমাদের কাছে ডুবে যাওয়া জাহাজটার লোকেশন জানতে চাইবে ভারত? মাথা ঝাঁকাল মেজর বাশার—জানাজানি হয়ে গেছে ব্যাপারটা। আমার অনুরোধ, দেশের স্বার্থে তোমরা দু'জনই মুখ বন্ধ রাখবে। যদি একান্তই বাধ্য করা হয়, ভুল তথ্য

দেবে। রাজি হয়ে বেরিয়ে গেল ওরা তাঁবু থেকে।

'ওদের দু'জনের কেউই মুখ খোলেনি। সেদিন রাত দুটোর সময় ঘুম থেকে তুলে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় রাশেদকে। আগেই নিয়ে আসা হয়েছে আহসানকে। সারা রাত ধরে জেরা করে ওদেরকে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ডি. এস. পি. কি এক কাংকারিয়া। ভয়ানক পাজি বলে বদনাম ছিল লোকটার। জেরার মুখে নতি স্বীকার করে শেষকালে একটা ভুল নক্সা এঁকে দিয়ে ছাড়া পায় দু'জন। সেই রাতেই আততায়ীর গুলি খেয়ে মারা যায় লেফটেন্যান্ট আহসান। ভোর রাতে অজ্ঞাত কারণে আগুন লেগে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় মেজর বাশারের তাঁবু। বাশার তখন পঁচিশ মাইল দূরের একটা ক্যাম্পে গিয়েছিল। ফিরে এসে প্রথমেই সে ধরে নেয় অন্যান্য সবকিছুর সাথে ম্যাপটাও পুড়ে গেছে। কিন্তু পরদিন দুপুর নাগাদ ছাই ঘেঁটে ম্যাপটা পাওয়া যায়—অর্ধেক। বাকি অর্ধেক পুড়ে গেছে। যে অংশটা পাওয়া যায় সেটা ম্যাপের দ্বিতীয় অংশ।'

'রাশেদ…'

মেজর জেনারেল রানাকে থামিয়ে দিলেন হাতের ইশারায়। 'ব্যাপার দেখে ভড়কে যায় রাশেদ। মেজরকে সব বলে সেইদিনই সাতদিনের ছুটি নিয়ে চলে যায় সে কোলকাতায়। ছয় থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত কোলকাতায় ছিল রাশেদ। ফেরে এগারো তারিখে। মেজর বাশার তখন কাঁধে গুলি খেয়ে হাসপাতালে। ওই দিনই রওনা হয় রাশেদ মেঘনায় একটা অস্ত্রবাহী স্টীমার ডুবিয়ে দিতে। মাঝপথে অ্যামবুশের শিকার হয়ে মারা যায়।'

অধৈর্য হয়ে উঠল রানা। বুড়োর আজ হয়েছে কি! রসিয়ে রসিয়ে গল্প বলার ঢঙে কথা বলছে কেন? আসল কথাটা কি? বলল, 'তার মানে ম্যাপটা আধখানই হয়ে রইল। রাশেদ বা আহসান কেউই বেঁচে নেই, কাজেই সঠিক নক্সা পাওয়ার কোন উপায় নেই। আড়াই টন সোনা ডুবে রয়েছে গভীর সাগরে। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের কি করবার আছে, স্যার?'

'তোমার কাজ, যারা এই সোনা উদ্ধার করবার চেষ্টা করছে, তাদের পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়া।'

'সোনা উদ্ধার করার চেষ্টা করছে! কারা?'

'সেটাই তোমাকে জানতে হবে। অনেক লোককে সন্দেহ করতে পারি আমরা। আড়াই টন সোনা, কে না পেতে চায়? একটা বিদেশী ট্রলারকে ধরে পোর্টে নিয়ে এসে গভীর সমুদ্রে ডুব দেয়ার সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। কোলকাতা থেকে খবর পেয়েছি, সেখানেও একাধিক ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছে।'

'কিন্তু জাহাজটা কোথায় ডুবেছে একথা কারও তো জানার কথা নয়, কিসের উপর ভিত্তি করে উদ্ধারের কাজ শুরু করবে ওরা?'

'আবার রাশেদের প্রসঙ্গে ফিরে আসতে হয়।' মেজর জেনারেল সামনে ঝুঁকে টোবাকোর কৌটোটা টেনে নিলেন নিজের কাছে। 'তার জীবনের দ্বিতীয় অসাধারণ ঘটনার কথা বলতে হয়। ঘটনাটা সবটুকুই আমাদের অনুমান। এক্ষেত্রে অনুমানই একমাত্র ভরসা। আমরা খবর পেয়েছি,

কোলকাতায় একাধিক ব্যক্তির কাছে ডুবে যাওয়া সোনার লোকেশান চিহ্নিত করা ম্যাপ রয়েছে। এই ম্যাপ তারা যেখান থেকেই সংগ্রহ করুক— সরবরাহকারী একমাত্র রাশেদ ছাড়া আর কেউ হতে পারে না।' পাইপে শেষটান দিয়ে এক রাশ ধোঁয়া উদগিরণ করে ছাই ঝাড়ায় মন দিলেন রাহাত খান। 'সন্দ্বীপ থেকে চার তারিখে ক্যাম্পে ফিরে আসে রাশেদ। সেই দিনই ম্যাপটা আঁকা হয়। সেদিন রাতেই গুলি খেয়ে মারা যায় লেফটেন্যান্ট। পুড়ে যায় মেজর বাশারের তাঁবু। নষ্ট হয় নক্সা।'

'এসবের পেছনে কি রাশেদের কোন হাত ছিল? নাকি কাংকারিয়া…'

'হতে পারে। প্রমাণ নেই। আমরা ধরে নেব কাজটা রাশেদের। ডোবা জাহাজে সোনা আছে জানতে পেরে মনে মনে প্ল্যান এঁটে ফেলে সে। ম্যাপটা নষ্ট করতে হলে আগুন না ধরিয়ে তার উপায় ছিল না। ধরে নাও আহসানকেও সেই হত্যা করেছে। তারপর খুব ঘাবড়ে যাওয়ার ভান করে ছুটি নেয় সে। ছয় তারিখে পৌঁছোয় কোলকাতায়। সরাসরি হোটেল খাসমহলে ওঠে। হোটেল ত্যাগ করে দশ তারিখে। পাঁচ দিন ছিল কোলকাতায়। এর বেশি আর জানা সম্ভব হয়নি তার ছুটি উপভোগের ঘটনা সম্পর্কে।

'লেফটেন্যান্টকে হত্যা এবং ম্যাপটা নষ্ট করার পরিকল্পনার সাথে সাথেই নিজের জন্যে নিশ্চয়ই সে একটা ম্যাপ আঁকে। আঁকতে তার কোন অসুবিধে না হবারই কথা। ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র ছিল সে আর্ট কলেজে। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল রাশেদ এই ম্যাপ তাকে কোটি কোটি টাকা হাতে পাওয়ার রাস্তা করে দেবে। নিজের আঁকা ম্যাপটা সাথে করে কোলকাতায় নিয়ে যায় সে। এবং পাঁচ দিন সেখানে থাকার সময় সেটা কারও কাছে বিক্রি করে দেয়। কার কাছে বিক্রি করেছে কেউ জানে না। যার কাছেই বিক্রি করুক, রাশেদের সেই ম্যাপ দেখে সে ডুপ্লিকেট, ট্রিপ্লিকেট কপি তৈরি করে বাজারে ছেড়েছে। আসল ম্যাপটা সে কাউকে দিচ্ছে না। একটু আধটু এদিক ওদিক করে বিভিন্ন পার্টির কাছে বেচছে সে। একটা ম্যাপ আমাদের লোক দেখেছে, কিন্তু হাতে রাখতে পারেনি কিছুতেই। সাজ্জাদের কথা মনে পড়ে?'

'শেষবার দেখা হয়েছিল গত বছর মার্চ মাসে বৈরুতে।'

'সাজ্জাদকে কোলকাতায় পাঠিয়েছিলাম এই ম্যাপের ব্যাপারে। গতকাল মারা গেছে সে। থিয়েটার রোডে ট্রাফিক অ্যাকসিডেন্ট।' কঠোর হয়ে উঠল মেজর জেনারেলের মুখের চেহারা।

তাকিয়ে রইল রানা মেজর জেনারেলের মুখের দিকে। ক্রমেই জটিল হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্টের প্রকৃতি।

'ক্যালকাটা পুলিস এই দুর্ঘটনার তদন্ত করছে। অগ্রগতির খবর দিতে পারেনি এখনও। যাক, তোমার মাথা ঘামাতে হবে না এ ব্যাপারে। সাজ্জাদের সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ম্যাপগুলো নাকি মোটামুটি একই রকম দেখতে, এবং জাহাজের অবস্থানটা প্রত্যেক ম্যাপেই দেখানো হয়েছে নির্দিষ্ট একটি জায়গায়। কিন্তু বি. সি. আই. এর কাছে যে আধ-পোড়া ম্যাপটা রয়েছে তার সাথে এই জায়গা মিলছে না।'

'তার মানে রাশেদের কাছ থেকে যে লোক ম্যাপটা কিনেছে সে বোকা নয়,' বলল রানা। 'জাহাজের সঠিক লোকেশন না দেখিয়ে নকল ম্যাপ বিক্রি করছে সে।'

'হ্যাঁ,' মেজর জেনারেল বললেন। 'তার মানে মূল ম্যাপটা তার কাছেই আছে। তোমার কাজ হবে লোকটাকে খুঁজে বের করা এবং ম্যাপটা দেশে ফিরিয়ে আনা। এ সোনা আমাদের চাই-ই।'

'কোত্থেকে শুরু করব কাজ, স্যার?' সাগ্রহে প্রশ্ন করল রানা।

'রাশেদের অতীত ঘাঁটতে হবে। ছুটি কাটাতে গিয়ে পাঁচদিন কোলকাতায় কি কি করেছিল সে খোঁজ করতে হবে। কার সাথে মিশেছে? কি কি করেছে? কাকে সে বিক্রি করেছিল ম্যাপটা? হোটেল খাসমহলে গিয়ে ওঠো। ওখান থেকেই শুরু করো কাজ। রাশেদের ছদ্মবেশ নাও। হোটেলের কেউ রাশেদকে এখনও হয়তো মনে রেখেছে। দেখলেই হয়তো চিনবে। সে তোমাকে আর এক লোকের সাথে দেখা করিয়ে দিতে পারে, যে লোক রাশেদকে তখন চিনত। লাইন আরও একটা আছে। খোঁজ নিতে চেষ্টা করো কার কাছে ম্যাপ আছে। হোক নকল। জানবার চেষ্টা করো কার কাছ থেকে কিনেছে সে ম্যাপটা।'

'রাশেদ মারা গেছে একথা...'

'কোলকাতার কেউ জানে না তার মৃত্যুর খবর। মুক্তিযুদ্ধের সময় নিহতদের তালিকা প্রকাশ করা হয়নি।'

রানা জানতে চাইল, 'রাশেদের বাবা মা যদি শোনেন?'

'তারা জানে সব।'

'মানে?' রানা অবাক হলো।

'রাশেদের ছদ্মবেশ নেবার পর তুমি রাজশাহীতে যাচ্ছ ওর মা-বাবার সাথে দেখা করতে। ছদ্মবেশ নিখুঁত হলো কিনা তা একমাত্র তারাই বলতে পারবে। রাশেদের অভ্যাস-অনভ্যাস সম্পর্কেও জানাতে পারবে তারা তোমাকে।'

'কতটুকু জানেন তাঁরা?'

'বলা হয়েছে দেশের গোপনীয় এক কাজে তাদের ছেলের ছদ্মবেশ নিয়ে এক যুবক কোলকাতায় যাবে। দেশের কাজ শুনে তারা রাজি হয়েছে সানন্দে। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই, শুধু রাশেদের বাবা-মা এ সম্পর্কে জানবে।' ফাইল থেকে একটা ফটো বের করলেন রাহাত খান। 'কাগজগুলো পড়ে মুখস্থ করে পুড়িয়ে ফেলো। আর এই ফটোটা, রাশেদের, সাথে রাখতে পারো।'

ফটোটা হাত বাড়িয়ে নিল রানা।

'রাশেদের ফটো। সম্ভবত কোলকাতার কোন আর্ট গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে তুলেছিল।'

ছবিটা দেখতে দেখতে রানা বলল, 'রাশেদের পিছনের দেয়ালে একটা অয়েল পেইন্টিং দেখা যাচ্ছে। আবছা মত। ছবিটার দু'পাশেও দুটো ফ্রেমের

কিনারা দেখা যাচ্ছে।'

'রাশেদ আর্টিস্ট ছিল, আগেই বলেছি। হয়তো কোলকাতার বিভিন্ন গ্যালারিতে গেছে সে। ফটো তুলেছে।'

ফটোটা পকেটে রাখল রানা।

'বি. সি. আই-এর কাছে যে অর্ধেক ম্যাপটা আছে সেটা তোমাকে কাল দেব। স্টাডি করার জন্যে।' একটু চিন্তা করলেন মেজর জেনারেল। 'আজ সোমবার। বুধবারে তুমি রাজশাহী যাচ্ছ। দু'দিন থাকবে ওখানে। শুক্রবার কোলকাতায় পৌঁছবে।'

'ইন্ডিয়ান সিক্রেট সার্ভিস...'

'ঘুমে অচেতন। কিছুই জানেনা তারা। এখনও।' মেজর জেনারেল পাইপের দিকে গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়ে বললেন, 'কালই তোমাকে আসতে হবে অনিলের মেকআপ রুমে। ছদ্মবেশের জন্যে। পাসপোর্ট ইত্যাদি কালই পাবে। কোন প্রশ্ন আছে?'

বিছানা থেকে নেমে বিবস্ত্র হলো রানা। শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরুল গুন গুন করতে করতে। তৈরি হয়ে নিয়ে রিস্টওয়াচ দেখার জন্য হাত তুলল বুকের কাছে। সাড়ে সাতটা। দরজার তালা লাগিয়ে নিচের লবিতে এসে প্রথমেই চোখ পড়ল, ক্লার্ক সুধীরের চেয়ারটা শূন্য।

'কক্ষটা আরামপ্রদ নয় কি, স্যার?' বুড়ো ম্যানেজার সকৌতুকে হাসছে।

'আটষট্টি নম্বর খালি না হওয়া পর্যন্ত ওখানে আছি।'

'ভাল কথা, স্যার দেখছি সান্ধ্য ভ্রমণে বেরুচ্ছেন, কোন ভদ্দরলোক খোঁজ করলে কোথায় গেছেন বা কখন ফিরবেন ইত্যাদি—'

'খোঁজ করবে না কেউ।'

'কোলকাতায় কি মশায়ের কোন বন্ধু বা বান্ধবী, আত্মীয় বা কুটুম্ব কেউ নেই?'

'না। আমি কাউকে বা কেউ আমাকে চেনে না এখানে।' মৃদু হাসল রানা, 'সুধীর বাবুকে দেখছি না যে?'

'পেটের ব্যথা। প্রবল যন্ত্রণা ভোগ করছিল, তাই ছেড়ে দিলাম।'

'কোথায় তিনি?'

'যন্ত্রণার কথা সত্যি হলে বাড়ি চলে গেছে।'

'সত্যি না হলে?' রানা হাসছে।

'নরকে। যেখানে ভ্রষ্টা রমণীরা যন্ত্রণা জুড়োয়।' হঠাৎ কোমরে হাত দিল। 'উহ্! বুঝলেন মশায়, আশি প্রকার...'

হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা। ট্যাক্সি নিল না। জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে আপন মনে হাঁটছে সে। হাতের ডানে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অভ হাইজিনকে রেখে কলুটোলা স্ট্রীট, মীর্জাপুর স্ট্রীট, এবং কলেজ স্ট্রীটের চৌমাথায় এসে ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। এত ভিড়ে কনুইয়ের ধাক্কা খেয়ে হাঁটতে ভাল লাগে?

আর খানিক এগিয়ে বাবু বাজার ও ওয়েলিংটন স্ট্রীটের চৌমাথায় এসে হাত তুলে ডাকল রানা 'ট্যাক্সি!'

সশব্দে ব্রেক কষে দাঁড়াল ট্যাক্সি। ঝটপট ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে ব্যাক ডোরটা খুলে ধরল শিখ ড্রাইভার।

সীটে গা এলিয়ে দিয়ে বসল রানা। 'ব্রিস্টল হোটেল।'

সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি ও চৌরঙ্গী রোডের সংযোগস্থলে ব্রিস্টল হোটেল। ডিনারটা ওখানেই সেরে নিতে চায় ও। তার আগে কিছু পান করলে মন্দ হয় না।

সবখানেই সেই একই সমস্যা...ভিড়। লাউঞ্জে তিল ধারণের জায়গা নেই। লাউঞ্জ তো নয়, যেন অজন্তা গুহা! সেই স্টাইলে শাড়ি পরে পেট, পিঠ ও পিছন দেখাবার প্রতিযোগিতা। মাড়োয়ারী যুবকদের হৈ-চৈ আর বাঙালী মেয়েদের খিলখিল হাসি অসহ্য। পানের আশা ত্যাগ করে এরই মধ্যে একটু জায়গা করে নিয়ে চোখ-কান বুজে খাওয়াটা সেরে নিল রানা। বেরিয়ে এল বাইরে। গড়ের মাঠে গেলে কেমন হয়? কোলকাতায় কি নির্জনতা মিলবে না কোথাও?

ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে হাঁটতে পনেরো বিশ হাত সামনে খয়েরী রঙের একটা শার্ট দেখল রানা। সুধীর নাকি! ঠিক বোঝা গেল না। সুধীরের গায়েও এই রঙের হাওয়াই শার্ট দেখেছিল ও। লোকটা হারিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

ইডেন গার্ডেনের কাছাকাছি গিয়ে আবার খয়েরী রঙের হাওয়াই শার্ট পরা লোকটাকে দেখতে পেল রানা। এদিক ওদিক চঞ্চল ভঙ্গিতে তাকাচ্ছে। দেখতে পায়নি রানাকে। সুধীর।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে লোকটা ডানদিকে ঘুরে দাঁড়াল। আবার তাকাল চারদিকে। পা বাড়াল একটা লোহার গেটের দিকে। গেটের মাথায় সাইন বোর্ড: পিপল্স্ আর্ট গ্যালারি।

গেট দিয়ে ভিতরে ঢোকার আগে আবার থমকাল সুধীর। গেটের পাশে গুজরাটি এক ছোকরা পান বিড়ির ডালা নিয়ে বসেছে। এক পা পিছিয়ে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পকেটে হাত দিল সুধীর। এক টাকার একটা নোট বের হয়ে এল পকেট থেকে, দেখল রানা। আবার নিজের চারপাশটা দেখে নিচ্ছে সুধীর।

চোখাচোখি হলো রানার সাথে এবার। একটু যেন চমকে উঠল সুধীর। টাকাটা মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে হন হন করে হাঁটতে শুরু করল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকেই। আর্ট গ্যালারিতে ঢুকল না।

ফোর্ট উইলিয়ামকে চক্কর দিয়ে গড়ের মাঠে এসে খুঁজে পেতে অপেক্ষাকৃত নির্জন একটা জায়গায় বসল রানা। নিজের অস্তিত্বটাকে অনুভব করা যাচ্ছে এতক্ষণে। চারিটা দিক বেশ অন্ধকার। কল-কোলাহল, হৈ হাঙ্গামা থেকে এ জায়গা বেশ অনেকটা দূর।

দুটো মেয়ের হাসির শব্দ ভেসে এল খানিকটা দূর থেকে। একজন আরেকজনের গায়ে ঢলে পড়ে হাসছে। আঁধারে দেখা যাচ্ছে না। চুপচাপ

বসে রইল রানা। একটু কান খাড়া করেই টের পেল আরেক ধরনের নাটক জমে উঠেছে ওর আশপাশে বেশ কয়েকটা রঙ্গমঞ্চে। চাপা ফিসফিসে কথা, হাসি।

মিনিট কয়েক হাসি মস্করা করে রানার দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হওয়ার পর একটা মেয়ের গলা শোনা গেল 'চ রে, চ। ঋষি ধ্যানে বসেছেন। ডিসটার্ব করলে শাপ দেবে—ভস্ম হয়ে যাব শেষে।'

'এই মাধবী!' আর একটা মেয়ের চাপা গলা। 'দ্যাখসে!'

আর কোন শব্দ নেই।

অন্ধকার ও নারীর মধ্যে কোথায় যেন একটা মিল আছে। অন্ধকার রহস্যময়ী। নারীও রহস্যময়ী। অন্ধকার আর নারীর মধ্যে মিল আছে একথা হঠাৎ মনে এল কেন? ভাবতে লাগল রানা। রাজশাহীর কথা মনে পড়ে গেল। আম বাগানের অন্ধকার···রানা হাঁটছে শুকনো পাতা মাড়িয়ে···হঠাৎ···সব মনে পড়ে গেল রানার।

দুই

রাজশাহী থেকে ট্রেনে চাঁপাই নবাবগঞ্জ প্রায় মাইল ত্রিশেক রাস্তা। ট্রেন থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ির সন্ধান করেছিল রানা। পিছন থেকে নাম ধরে কেউ ডাকল, 'রাশেদ!'

শক্ত হয়ে গেল রানার মাংসপেশী। তাকাল না রানা। যেমন হাঁটছিল তেমনি হাঁটতে লাগল। স্টেশনে কেউ থাকবে এমন কথা তো ছিল না। রাশেদের পরিচিত কেউ? কি জবাব দেবে সে?

'রাশেদ!'

আবার সেই ডাক। বয়স্ক লোকের গলা। দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। কিন্তু পিছন ফিরে তাকাল না। ভ্যালা ফ্যাসাদ হলো তো!

'রাশেদ!'

এবার ঘুরে দাঁড়াল ও। ভদ্রলোককে দেখেই চিনল রানা। রাশেদের বাবা, প্রৌঢ়, অহিদুজ্জামান খান। হাসল রানা। চট্ করে দেখে নিল আশপাশটা। কেউ লক্ষ করছে না ওদের। রাশেদের বাবা কাছে এসে দাঁড়ালেন। ঘামছেন ভদ্রলোক। রানার একটা হাত ধরলেন শক্ত করে। কথা বলতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পারলেন না। ভাবাবেগে বোবা হয়ে গেছেন তিনি।

'স্টেশনে আপনার আসার কথা ছিল না।'

'এমনি এলাম। মনটা কেমন যেন করছিল।' রাশেদের বাবা হাঁপাচ্ছেন, 'তোমাকে দেখে···হুবহু এক চেহারা···আগে থেকে না জানা থাকলে বিশ্বাস করতাম না তুমি রাশেদ নও···'

রানা হাসল। 'ছদ্মবেশ তাহলে নিখুঁত হয়েছে?'

'ছদ্মবেশ বলে মনেই হয় না,' রাশেদের বাবার দু'চোখের কোণে পানি জমে উঠল। দ্রুত সামলে নিলেন ভদ্রলোক নিজেকে। 'তোমাকে তুমি বলছি বলে...'

রানা বলল, 'সেকি! আপনি তো আমার বাবার বয়েসীই।'

'চলো, বাবা,' ভদ্রলোক ছাড়লেন না রানার হাত, 'তোমার জন্য গাড়ি এনেছি আমি।'

গাড়ির কথা শুনে একটু অবাক হলো রানা। অহিদ সাহেবের গাড়ি আছে একথা মেজর জেনারেল উল্লেখ করেননি।

'এখানে কেউ আপনাকে চেনে না তো?'

'খুব কম আসি এদিকে। চেনা জানা লোক এদিকে কেউ নেই।'

বিশাল এক সুপারভক্সলে গিয়ে উঠল ওরা। ড্রাইভিং সীটে রাশেদের বাবা। রানা পাশে।

দু'পাশে বনভূমি। ইট বিছানো রাস্তা মাঝখানে। সূর্য অস্তমুখী। উঁচু ডালের পাতায় সূর্য কিরণ ঝলমল করছে। প্রায় নির্জন রাস্তা। কদাচ দু'একটা রিকশা আর এক্কা গাড়ি নজরে পড়ে। কয়েক বর্গমাইল জুড়ে একেকটা আম বা লিচুর বাগান। হরেক জাতের পাখির স্বর্গ।

রাশেদের বাবা একমনে গাড়ি চালাচ্ছেন।

মাইলখানেক পরই ইট বিছানো রাস্তার সমাপ্তি। এবার মেঠো পথ। দু'পাশে বাগান।

'চৌধুরী সাহেবের বাগান এখান থেকেই শুরু।' রাশেদের বাবা নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, 'ওঁর সয়-সম্পত্তি আমিই সব দেখাশোনা করি। ছোটবেলায় আমরা একসাথে বড় হয়েছি—বন্ধু ছিলাম।' ছিলাম শব্দটার উপর জোর দিলেন রাশেদের বাবা।

বিশাল এক আম বাগানের মধ্যে দিয়ে উঁচুনিচু পথ ধরে চলেছে ভক্সল। ফজলি আমের বাগান।

'সুযোগ সুবিধে প্রচুর পাই। প্রায় রাজার হালে আছি। কিন্তু বন্ধুত্বের সেই ঘনিষ্ঠতা নেই এখন আর। কারণটা রাশেদ। রাশেদ বড় হয়ে এমন সব কাণ্ড করতে শুরু করেছিল...' হঠাৎ থামলেন ভদ্রলোক। 'পরে এসব কথা বলব। তা তুমি বাবা দু'দশদিন থাকবে তো?'

'জ্বি না।' বলল রানা। 'পরশু ফিরতে হবে আমাকে।'

'ঢাকা থেকে যে অফিসার ভদ্রলোক এসেছিলেন তিনি অবশ্য কোন বিষয়ে তোমাকে প্রশ্ন করতে নিষেধ করে দিয়েছেন। কিছু জিজ্ঞেস না করাই ভাল।' আপন মনে বকছেন। 'দেশের কাজে রাশেদের ছদ্মবেশ নিয়েছ, খুশির কথা বৈকি!' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন। 'রাশেদের ঘরটাই পরিষ্কার করে রেখেছি আমরা তোমার জন্যে।'

'নিশ্চয়ই খুব ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি আপনাকে। কিন্তু...'

'ঝামেলা কিসের, বাবা!' ভদ্রলোক থামলেন, 'আমি নিতে না চাইলে কি হবে, অফিসার ভদ্রলোক জোর করে তোমার ব্যাপারে খরচ করার জন্যে

মোটা টাকা দিয়ে গেছেন।'

'গাড়িটা কার?' জানতে চাইল রানা।

'চৌধুরী সাহেবের।'

'তিনি জানেন যে আমি আসছি?'

'মোটেই না।' রাশেদের বাবা মাথা নাড়লেন, 'কাউকে জানাইনি তোমার কথা। গাড়িটা আমি প্রায়ই ব্যবহার করি। কোন প্রশ্ন উঠবে না। ভাল কথা, চৌধুরী সাহেব যেন তোমাকে দেখে না ফেলেন, বাবা। ওর বাড়িটা পশ্চিমের বাগানের শেষ প্রান্তে। ওদিকে ছাড়া আর যে কোন দিকে বেড়াতে পারো তুমি।'

'বেশ বড় বাগান।' মন্তব্য করল রানা।

'এসে পড়েছি বাড়ির কাছে,' বললেন রাশেদের বাবা, 'রাশেদের মা তোমার জন্যে পথ চেয়ে আছেন।'

সুন্দর, বড়সড় ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাড়িটা। গাড়ি থেকে নেমে কাউকে আশপাশে দেখল না রানা। ওর হাত ধরে উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠে এলেন রাশেদের বাবা, 'কই গো! কোথায় গেলে!'

বারান্দার একপাশে দরজার আড়াল থেকে রাশেদের মা'র কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এই যে।' বারান্দায় বেরিয়ে এলেন প্রৌঢ়া মহিলা। মুখটা ঘোমটায় ঢাকা।

'এ কি!' রাশেদের বাবা মাথা নাড়লেন। 'ছেলের সুমুখে আবার ঘোমটা কেন?'

'এসো, বাবা!' কান্না ভেজা গলা। ঘোমটা সরে গেল কপাল থেকে। ভেজা ভেজা চোখ মেলে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন প্রৌঢ়া রানার দিকে।

সব জড়তা চোখের পলকে কেটে গেল। নিজের ছেলের চেহারার সাথে কোথাও এতটুকু অমিল নেই দেখে এগিয়ে এসে রানার হাত ধরলেন, বললেন, 'এসো বাবা, তোমার ঘরে গিয়ে বসি।'

'গল্প করো মা-বেটাতে,' রাশেদের বাবা বললেন। 'আমি গাড়িটা রেখে আসি।'

সাজানো গোছানো একটা কামরায় নিয়ে এলেন রানাকে রাশেদের মা। 'জুতো মোজা খুলে আরাম করে বসো, বাবা।' খাটের উপর বসলেন পা ঝুলিয়ে। 'তোমাকে দেখে কে বলবে যে তুমি আমার রাশেদ নও! বড় লক্ষ্মী ছেলে ছিল সে বাবা আমার। রাশেদের প্রশংসায় পাঁচ গ্রামের লোক পঞ্চমুখ।' রুদ্ধ হয়ে এল প্রৌঢ়ার কণ্ঠস্বর।

'এই সন্ধ্যায় আর বাইরে-টাইরে বেরিয়ো না।' রানাকে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আম বাগানের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে খানিক পর বললেন প্রৌঢ়া, 'একটা ব্যাপারে একটু সাবধান থেকো, বাবা। চৌধুরী সাহেবরা আমাদের মনিব। তোমার বিষয়ে ওদেরকে কিছুই বলা হয়নি। ওদিকে তুমি না গেলেই ভাল হয়, দেখে ফেলতে পারে। তখন নানান প্রশ্ন উঠবে।'

একটা চেয়ারে বসল রানা।

'তুমি ছবি আঁকতে পারো, বাবা?'

রানা মাথা নাড়ল, 'না।'

'রাশেদ খুব ভাল আঁকতে পারত। কত লোক প্রশংসা করত ওর ছবির।' মা তার ছেলের প্রশংসায় অকৃপণ।

বিশ মিনিট পরই রাশেদের বাবা হাজির। 'কি গো! ছেলেকে এতদিন পর পেয়ে গল্প-গুজব করলেই শুধু চলবে, নাকি খেতে টেতে দেয়ার ব্যবস্থা করবে!'

'এই যে যাচ্ছি।' প্রৌঢ়া উঠে দাঁড়ালেন, 'তুমি, বাবা হাত-মুখ ধোও। আমি ওদিকের ব্যবস্থাটা সেরে আসি।'

রানাকে খাইয়ে নিজে তৃপ্ত হতে চান রাশেদের মা। ফলে প্রচুর খেতে হলো রানাকে। আর পারব না বললেই প্রৌঢ়া কেঁদে ফেলেন আর কি। অগত্যা বাধ্য ছেলের মত রুই মাছের মুড়ো, মিহি চালের পোলাও, খাসীর মগজ ভাজি, মুরগীর রান, আনারসের টক, ঘরে পাতা দই, অসময়ের ফল বারমেসে আম ও সবশেষে গ্লাস ভর্তি দুধ খেয়ে ফিরে এল নিজের কামরায়। পিছন পিছন রাশেদের বাবা মা দু'জনেই এলেন। ঘুমোবার আগে দরজা বন্ধ করে দিতে বললেন দু'জনেই বারবার। স্মরণ করিয়ে দিলেন রাতে কোন রকম অসুবিধে হলে লজ্জা না করে যেন ডাকে ওঁদেরকে।

দরজা বন্ধ করে দিয়ে অ্যাটাচী কেস খুলে রাহাত খানের দেয়া কাগজ দুটো বের করে পদ্মাসনে বসল রানা বিছানায়। ঘণ্টা খানেক ধরে মুখস্থ করল কাগজে লেখা প্রতিটি তথ্য। তারপর পুড়িয়ে ফেলল কাগজ দুটো। আলো নিভিয়ে শোবার আগে রিস্টওয়াচ দেখল ও। রাত মাত্র সাড়ে আটটা। গ্রাম এলাকার অনেক রাত।

সকালবেলা নাস্তার পর সিগারেট ধরিয়ে আনমনে কি যেন ভাবছিল রানা। গাড়ির শব্দ হলো। জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল ভক্সলটা। নামছেন রাশেদের বাবা। মোটাসোটা হাসিখুশি প্রকাণ্ড একজন লোক ড্রাইভিং সীটে বসে রয়েছে। গাড়ি ব্যাক করে চলে গেল সে।

কামরায় রাশেদের মা ঢুকলেন। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা, 'ওঁর নামই কি চৌধুরী?'

'হ্যাঁ,' রাশেদের মাকে বিচলিত মনে হলো, 'তোমাকে দেখে ফেলেনি তো?'

'না বোধহয়।'

'না দেখাই ভাল,' ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত আবার মুখ খুললেন প্রৌঢ়া, 'চৌধুরী লোকটা তেমন সুবিধের নয়। রাশেদের সাথে বনিবনা হত না মোটেই। ওদের বাড়ির ধারে কাছে যাবার অনুমতি ছিল না রাশেদের।'

'তাই নাকি?'

'বেশ কয়েকবার রাশেদের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করেছে চৌধুরী সাহেব। অন্যায় একদম সইতে পারত না রাশেদ। তাই ওর বাবার সাথেও ঠুকুরমুকুর প্রায়ই হত। ওর বাবা তোমাকে এসব বিষয়ে নিশ্চয়ই কিছু

বলেছে?'

বুঝতে পারল রানা কথা আদায় করতে চাইছেন প্রৌঢ়া। বুঝতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না যে এ বাড়ির পরিবেশ খুব একটা শান্তিময় ছিল না। কে জানে রাশেদ এই কামরাতেই কতবার তার বাবার সাথে তুমুল ঝগড়া বাধিয়েছে।

'কই, না তো!' বলল রানা।

'বাপ-ছেলেতে কোন মিল ছিল না। রাশেদের গড়ন, স্বভাব, চরিত্র—সবই ছিল ওর বাপের বিপরীত। ও ওর মামাদের মত ছিল। যা কিছু বলার আমাকে বলত, সব ব্যাপারেই আমার কাছে ছুটে আসত। চিঠিপত্রও যা লিখেছে আমাকে লিখেছে।'

'চিঠিগুলো আমি দেখতে পারি?'

'দাঁড়াও, নিয়ে আসি আমি।' প্রৌঢ়া চলে গেলেন। প্রায় সাথে সাথেই কামরায় ঢুকলেন রাশেদের বাবা।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, বাবা?'

'করুন।'

'তোমার নামটা...'

'আমি দুঃখিত,' রানা মৃদু কণ্ঠে বলল।

'জানতাম, তুমি বলবে না,' একটু গম্ভীর দেখাল রাশেদের বাবাকে, 'এবং আমার বিশ্বাস হাজারও প্রশ্ন করলেও রাশেদ সম্পর্কে সত্যি কথা বলবে না তুমি।'

'তার মানে?'

'রাশেদকে আমি চিনতাম। ভুলে যেয়ো না সে আমারই ছেলে ছিল। গতকাল গাড়িতে বসে বলছিলাম না যে চৌধুরীর সাথে আমার বন্ধুত্ব নষ্ট হবার কারণ ছিল রাশেদ? কেন বলেছিলাম জানো?' ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তিনি হঠাৎ, বসে পড়লেন খাটের উপর, 'মানুষ হিসেবে মোটেই সে ভাল ছিল না। এখানকার ডাক্তারের একটা মেয়ে ছিল। তার সাথে গোপনে মেলামেশা করত রাশেদ, অবৈধভাবে। মেয়েটার নাম জাহানারা। জাহানারা গর্ভবতী হতে তার বাবা আমাকে সব কথা জানায়। রাশেদকে আমি আদেশ করি মেয়েটাকে বিয়ে করার জন্যে। রাশেদ পালিয়ে গেল। জাহানারাকে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। পাপমুক্ত হয়ে সে আর ফিরে আসেনি এখানে। শুনেছি, বিয়ে হয়ে গেছে তার। পাপ থেকে উদ্ধারের সমস্ত খরচ বহন করতে হয় আমাকে। এছাড়া রফিক নামে এখানে একটা ছেলে আছে। রাশেদ তার সাথে প্রায়ই ঝগড়াঝাটি করত গায়ে পড়ে। শেষবার রাশেদ এমন নিষ্ঠুরভাবে তাকে মারে যে ছেলেটার একটা চোখ চিরকালের জন্য নষ্টই হয়ে গেছে।'

'চৌধুরী সাহেবের সাথে কি ঘটেছিল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'গাড়ি চুরি করেছিল,' রাশেদের বাবা বললেন, 'গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিল ঢাকায় নিয়ে গিয়ে। আরও কত অত্যাচার যে করেছে, লেখাজোখা নেই।'

'আপনার স্ত্রী এসব জানেন?'

'না। ওর ধারণা ওর ছেলে ছিল হীরের টুকরো!' রাশেদের বাবা ম্লান হাসলেন, 'কিন্তু আমি জানি!'

'যাই হোক, শেষ পর্যন্ত রাশেদ দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছে। এই একটা ব্যাপারে তো আপনি অন্তত গর্ব বোধ করতে পারেন।'

'দেখো বাবা, কেন যেন আমার মনে হচ্ছে রাশেদ খারাপ কিছু কাজ করে মরেছে। সেই খারাপ কাজটা যে কি তা এখন তোমরা প্রকাশ করতে চাও না বুঝতে পারছি। কিন্তু একটা অনুরোধ, কোন দিন যদি প্রকাশ করো তাহলে ওর মা'র সামনে নয়। যা বলবার দয়া করে আমাকেই বোলো। তোমার কাছে এইটাই আমার অনুরোধ।'

'কোথায় রেখেছিলাম মনে পড়ছিল না।' রাশেদের মা একগাদা চিঠিপত্র নিয়ে কামরায় ঢুকলেন।

'রাশেদের চিঠি বুঝি?'

স্বামীর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন প্রৌঢ়া, চোখে সন্দেহের দৃষ্টি। 'হ্যাঁ। বসে রয়েছ যে, বাজারে যাবে না নাকি আজ?'

'সে কি!' অপ্রতিভ দেখাল রাশেদের বাবাকে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। 'বাজারে যাব না মানে! চলো দেখি, কি কি আনতে হবে লিখে নেয়া যাক।'

স্বামী-স্ত্রী বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

চিঠিগুলো নিয়ে বসল রানা। বেশিরভাগ চিঠিই কুমিল্লা থেকে পোস্ট করা। কারণটা সহজেই অনুমান করা যায়। আগরতলা থেকে কুমিল্লা কাছে। বর্ডার ক্রস করে চিঠি পোস্ট করত রাশেদ। রানা খুঁজছিল সেই জাহাজটা জ্বলতে দেখার পর রাশেদ কোন চিঠি লিখেছিল কিনা। এগারো নম্বর চিঠিটা খুলে সন্তুষ্ট হলো রানা। অক্টোবরের তিন তারিখে লেখা চিঠি, পোস্ট করা হয়েছে ফেনী থেকে। চিঠিটার অধিকাংশ অন্যান্য আর সবগুলোর মতই সাদামাঠা। কিন্তু শেষের অংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ।

'...সন্দ্বীপে এসে ঠেকলাম আমরা। ক্লান্তিতে সাগর পারেই নারকেল গাছের নিচে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আমরা। রাত যখন সাড়ে চারটে, দেখলাম এক আশ্চর্য দৃশ্য। দূর সমুদ্রে দাউ দাউ জ্বলছে আগুন। আগুন দেখেই বুঝলাম, কাজটা আমাদের বন্ধু কামালের। প্রাণ দিয়ে ধ্বংস করেছে সে শত্রুদের জাহাজ। শ্রদ্ধায় মাথা হেঁট হয়ে গেল আমার। আমি জানি, এতবড় আত্মত্যাগ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আবার ভাবি, বোকার মত কাজ করল কামাল। এই আত্মত্যাগের কি প্রতিদান দেবে দেশ ওকে? খুব সম্ভব লবডঙ্কা। রক্তের বিনিময়ে, প্রাণের বিনিময়ে কাদেরকে ক্ষমতায় আনছি আমরা? কোলকাতায় বসে মদ আর মেয়েমানুষের সাথে যারা যুদ্ধ করছে—তাদের? মাঝে মাঝে মনটা বড় দমে যায় মা।...

রাশেদ।'

রানা লক্ষ্য করল প্রত্যেকটি চিঠিতেই হতাশা, সন্দেহ, আত্মগ্লানি। মা বাবার

প্রতি স্বাভাবিক ভালবাসার চিহ্ন বর্জিত।
শেষ চিঠিটা রাশেদ লিখেছে কোলকাতা থেকে।

'মা,
কোলকাতায় বেড়াতে এসেছি। হোটেল খাসমহলে উঠেছি। আটষট্টি নম্বর কামরায়। হোটেলেরই একজন লোকের মাধ্যমে পরিচয় হয়েছে একটা দারুণ মেয়ের সাথে। খুব ভাল মেয়ে। ওর সাথে ঘুরে ঘুরে শহরটা প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি এই তিন দিনেই।
এখানে এসে অবধি ভীষণ ব্যস্ত আছি। তোমাকে চিঠি লিখছি রাত বারোটায়। চিঠি শেষ করেই আবার বেরিয়ে যাব। বিশেষ একটা কাজে ছুটোছুটি করতে হচ্ছে। এতদিন প্রত্যেকটা চিঠিতে টাকার অভাবের কথা লিখেছি তোমাকে। কিন্তু এখানে টাকার কোন অভাবই নেই আর আমার। যত ইচ্ছে খরচ করতে পারি। যত খুশি!
এগারো তারিখে আগরতলায় পৌঁছুব। তারপর পোস্ট করব এ চিঠি। আজ এখানেই শেষ করি।

রাশেদ।'

চিঠিটা লিখেছে রাশেদ অক্টোবরের আট তারিখে।
সারাদিন নানান টুকিটাকি কথায় রাশেদ সম্পর্কে অসংখ্য ছোটখাট তথ্য জেনে নিল রানা। রাশেদের মায়ের একনিষ্ঠ প্রশংসার সাথে কিছু নিজস্ব কল্পনা মিশিয়ে বুঝে নিল রাশেদের ব্যাকগ্রাউন্ড।
রাশেদের বাবা দুপুরে খেতে আসেননি।
তিনি এলেন সন্ধে সাড়ে সাতটায়। জিজ্ঞেস করতে বললেন, 'চৌধুরী আজ জোর করে খেতে বসাল। এড়িয়ে যেতে পারলাম না। খাওয়ার পর মাছ ধরতে যাবে, আমাকে না নিয়ে যেতে চায় না। হাজার হোক মনিব, না গিয়ে উপায় কি।'
রাত আটটায় খেয়ে দেয়ে রাশেদের বাবা-মা বিদায় নিল। রানা কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রাখল দরজা বন্ধ করে দিয়ে। সকাল বেলাই বিদায় হবে ও।
জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল রানা। মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সামনের আমবাগানের দিকে। বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে। আকাশে তারার মেলা। হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন রানাকে। চোখ টিপছে।
খানিক চিন্তা করল রানা। চৌধুরীর বাড়িটার দিকে একবার গেলে হয়। রাশেদের বাবা-মার ঘোর আপত্তি ওদিকে ওকে যেতে দিতে। আপত্তির একটা কারণ জানা আছে রানার। কিন্তু দ্বিতীয় কোন কারণ নেই তো?
ঘন্টাখানেক পরে নিঃশব্দ পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল সে।
নিস্তব্ধ, নিঝঝুম আমবাগান। পাতার ফাঁক দিয়ে চন্দ্রকিরণ নেমে এসে নকশা এঁকেছে রাস্তায়, ঘাসে। ধীর পায়ে এগোল রানা। পা ফেললেই মড় মড়

করে ওঠে শুকনো পাতা। থমকে দাঁড়াল রানা। অদূরে একটা ঝোপ নড়ছে। ডান দিকে দেখা যাচ্ছে সরু একটা পথ।

ঝোপটার দিকে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে রানা। জ্বলজ্বলে দুটো চোখের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল হঠাৎ। একটা শেয়াল উঁকি দিয়ে দেখছে রানাকে।

রানার হাতে লাইটারটা ক্লিক করে জ্বলে উঠতে দেখে খিঁচে দৌড় দিল শেয়ালটা। পা বাড়াল রানা। ফজলি, ল্যাংড়া, গোপালভোগ, লক্ষণভোগ, হিমসাগর আর রাণীপছন্দ আমের আলাদা আলাদা বাগান। তারপর তিন একর জায়গা জুড়ে লিচু বাগান। আবার শুরু হলো আম। কাজটা কি ভাল হচ্ছে? ফিরে গেলে কেমন হয়? বাগানটা কোন্‌দিকে কত বড়, চৌধুরীব বাড়ি এখান থেকে ঠিক কতটা দূরে কিছুই জানা নেই। ছমছমে বিস্তীর্ণ বাগানে এলোমেলো হেঁটে কি লাভ?

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সশব্দে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা পাখি। বহুদূরে কে যেন কাকে ডাকছে বলে সন্দেহ হলো। কান পাতল রানা।

রাশেদের বাবা মা টের পেয়ে খুঁজতে শুরু করেনি তো ওকে?

বেশ কিছুক্ষণ কান পেতেও আর কিছু শুনতে পেল না সে। পা বাড়াল সামনে। দেখাই যাক না আরও খানিকটা এগিয়ে।

চাঁদের আলো ও অন্ধকার মিলেমিশে বাগানের ভিতর আলোছায়ার রহস্যময় পরিবেশ। গা ছমছম করছে। এমনি রাতে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে হয়তো কতদিন গা ছমছম করেছে রাশেদেরও। এই বাগানে হেঁটেছে, খেলেছে শিশু, কিশোর, তরুণ রাশেদ। আজ আর সে নেই।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মনে হলো এদিকের গাছ পালা বেশ ঘন। গভীর জঙ্গলের মত লাগছে। শেয়াল ডেকে উঠল অদূরেই। কেন যেন সন্দেহ হলো ওটা শেয়াল নয়, কোন মানুষ শেয়ালের গলা নকল করে ডেকে উঠেছে।

হেসে ফেলল রানা। অকারণেই ভয় পাচ্ছে সে। দ্রুত পা চালাল আবার। মড় মড় করে শব্দ হচ্ছে শুকনো পাতায় পা পড়ায়। বেশ কিছুক্ষণ হাঁটবার পর আলো দেখতে পেল রানা। বহুদূর থেকে বৈদ্যুতিক আলো গাছের ডালপালায় এসে পড়েছে বলে প্রথমে মনে হয়েছিল ওটা চাঁদেরই আলো। খানিক পরই ভুল ভাঙল।

বাগান শেষ হয়ে এসেছে। প্রকাণ্ড একটা বাড়ির একাংশ দেখা যাচ্ছে দূরে। আম বাগানের বাইরে বেরিয়ে এসে ছোট মাঠটার একপ্রান্তে দাঁড়াল রানা।

চৌধুরীর বাড়িটা অনেকখানি জায়গা জুড়ে। বাড়ির সামনে একটা ষাট পাওয়ারের বালব জ্বলছে। সবগুলো জানালা বন্ধ। বালবটা না জ্বললে বিশ্বাস করা কষ্টকর হত এ বাড়িতে মানুষ বাস করে।

বাড়ির সামনে বেশ বড়সড় একটা পুকুর। পুকুরের ধার ঘেঁষে এগিয়ে চলল রানা। পুকুর শেষ হতেই ফুলের বাগান। বাগানের ভেতর দিয়ে চওড়া

ইঁট বিছানো রাস্তা।

উঁচু বারান্দার সিঁড়ির দিকে হাঁটছিল রানা। হঠাৎ কেন যেন মনে হলো কেউ লক্ষ্য করছে ওকে। হাঁটতে হাঁটতেই ঘাড় ফিরিয়ে ফুল বাগানের এদিক ওদিক তাকাল সে। বাগানের একপ্রান্তে কি যেন নড়ে উঠল না?

বারান্দার ছায়ায় উঠে ভাল করে চারদিকে নজর বুলাল রানা। কাউকে দেখতে না পেয়ে এগোল বারান্দা ধরে।

ডান দিকে মোড় নিয়ে গজ দশেক যেতেই একটা আলোকিত জানালা চোখে পড়ল।

জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়াল রানা। উঁকি দিয়ে ভিতরে তাকাল। প্রথমে চোখ পড়ল একটা টেবিলের উপর। গাদা গাদা বই এলোমেলো ছড়ানো রয়েছে টেবিলে। টেবিলের উপর পা তুলে একটা চেয়ারে বসে রয়েছে মোটাসোটা চৌধুরী। পড়ছে। একটা ইংরেজী বই।

জানালার কাছ থেকে সরে এল রানা। অহেতুক বাড়িটার কাছে ঘুর ঘুর করার কোন মানে হয় না। রাশেদের বাবা মা হয়তো ওর পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে এই ভয়েই এদিকে আসতে বারবার নিষেধ করেছেন ওকে। অন্য কোন কারণ নেই।

বাড়িটা বাইরে থেকে একপাক ঘুরে দেখে নিয়ে ফিরতি পথে হাঁটা ধরল সে।

সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেল না রানা। আক্রান্ত হবার আগে কোন শব্দই শুনতে পায়নি ও। দেখতেও পায়নি কিছু। একটা ঝোপের আড়াল থেকে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল কেউ ওর উপর। তৈরি ছিল না রানা। পড়ে যাচ্ছিল টাল সামলাতে না পেরে।

শক্রু ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে খাড়া করে রাখল। মুহূর্তে সর্বশরীর পাথরের মত শক্ত হয়ে গেল রানার। দুটো হাত সাপের মত পেঁচিয়ে ধরেছে ওর গলা।

তিন

কনুই চালাতে গিয়েও চালাল না রানা।

দুটো নরম হাত নিচের দিকে টানছে ওর মাথাটাকে। পরমুহূর্তে চুমোয় চুমোয় দম বন্ধ হয়ে যাবার দশা হলো রানার।

'রাশেদ! রাশেদ!'

চুড়ির শব্দ হলো। নরম হয়ে এল রানার শরীরের মাংসপেশীগুলো। বুঝতে পারল ও আক্রমণকারীর হাত দুটো কেন অত নরম নরম ঠেকছিল। মিষ্টি একটা সেন্টের সুবাস পেল ও।

'রাশেদ!' চুমো খাচ্ছে পাগলিনীর মত মেয়েটা রানার নাকে, মুখে, গালে

ও কপালে। দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে ওকে।

'কোথায় ছিলে তুমি এতদিন!' মেয়েটা গলা ছেড়ে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল, 'হায় খোদা! আমরা সবাই জানি তুমি নেই!'

কিছু একটা বলা দরকার। অনুভব করল রানা। 'তুমি তাহলে দেখেই আমাকে চিনেছ?'

'বাগানে বসে ছিলাম চুপচাপ। তোমাকে বারান্দায় উঠতে দেখেছি। তখনই চিনতে পেরেছি, কিন্তু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। এতটুকু বদলাওনি তুমি! আশ্চর্য!' মেয়েটা একহাতে রানার কোমর বেষ্টন করে আকর্ষণ করল, 'ভেতরে চলো।'

'যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'বাবা পড়ছে। টের পাবে না।'

চৌধুরীর মেয়ে! সেলিনা! রাশেদের প্রথমদিকের দু'একটা চিঠিতে এর উল্লেখ আছে।

'জানি,' বলল রানা। 'জানালা দিয়ে দেখেছি।'

ফুল বাগান থেকে বারান্দায় উঠে এল ওরা।

'আস্তে!' ফিসফিস করে সাবধান করল সেলিনা রানার কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে, 'পা টিপে।'

দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল সেলিনা রানাকে। এখনও ফিসফিস করে কথা বলছে সে। এবারের গলা চাপা উত্তেজনায় কাঁপা কাঁপা, নেশাগ্রস্ত।

'খেলাঘরে গিয়ে বসি, কি বলো, রাশেদ? মনে আছে না?' খামচে ধরল রানার হাত।

সেলিনার গলার স্বর শুনেই রানা বুঝতে পারল খেলাঘরে রাশেদ আর ও কি খেলা খেলত। ঘাবড়ে গেল সে। বিপদ!

'খুব মনে আছে।'

সিঁড়িটা অন্ধকার।

দোতলার বারান্দা ধরে খানিক দূর এগিয়ে, একটা ভেজানো দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল সেলিনা। 'এসো রাশেদ।'

দ্রুতহাতে জানালার ভারী কার্টেনগুলো টেনে দিয়ে আলো জ্বালল সেলিনা। 'দরজাটা বন্ধ করে দাও।' আদেশ করল রানাকে।

দরজা বন্ধ করে সেলিনার দিকে ফিরল রানা। পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটা। ঢোক গিলল রানা। উদ্ভিন্নযৌবনা অপূর্ব সুন্দরী এক যুবতী।

ঝট করে ঘুরে দাঁড়াল সেলিনা। ফিক করে হাসল। বলল, 'জানি দেখছিলে আমাকে। আগের চেয়ে অনেক বড় হয়েছি, না?' হঠাৎ খাদে নামল কণ্ঠস্বর, 'কাছে এসো।'

ঘটনার আকস্মিকতায় বেশ একটু ঘাবড়ে গেল রানা। কি করা উচিত

ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

বেশি কথা বলবে না ঠিক করেছে সে। ভুল হবার সম্ভাবনা তাতে কম।

মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল রানা। চোখ রাখল সেলিনার চোখে।

এক পা পিছিয়ে গেল সেলিনা। রানাকে দেখছে সে। পা থেকে মাথা অবধি। হাসছিল, ধীরে ধীরে মুছে গেল হাসি। রানার পা থেকে সেলিনার চোখের দৃষ্টি উঠে আসছে উপর দিকে।

নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছে না রানা। ভয় লাগছে। ধরা পড়ে গেল নাকি!

রানার মুখের উপর এসে থামল মেয়েটার দৃষ্টি। নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। কেমন যেন ম্লান হয়ে এল ওর মুখের চেহারা।

অপেক্ষা করছে রানা। এক একটা মুহূর্ত এক একটা যুগ যেন। সেলিনার মুখের দিকে চেয়ে আছে ও।

নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরল সেলিনা। ভাঁজ পড়ল গালে। চোখ দুটোর পাতা বার কয়েক কাঁপল। গাল বেয়ে টপ্ টপ্ করে দু'ফোঁটা পানি পড়ল পায়ের কাছে। হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল সে রানার বুকে।

বুকে গাল চেপে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল সেলিনা। প্রচণ্ড ভাবাবেগে থেমে থেমে বলছে সে, 'কোথায় ছিলে তুমি···রাশেদ! কেন আমাকে জানাওনি তুমি বেঁচে আছ। কেন! কেন!! কেন!!!'

'পাগলামি কোরো না, সেলিনা!' সেলিনার পিঠে হাত বুলাল রানা। 'সব কথা তোমাকে বলা যাবে না। কিন্তু এটুকু তোমাকে বলতে পারি, আমার অজ্ঞাতবাসের স্বপক্ষে অনেক কারণ আছে। পরে হয়তো সময় আসবে যখন সব কথা তোমাকে বলতে পারব।'

'শুধু যদি জানতাম তুমি বেঁচে আছ!' একটু বিরতি নিয়ে সেলিনা বলল, 'জানো এই তিনটে বছরে কত কি ঘটে গেছে? তোমার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর আমার কোন আপত্তি কানে তোলেনি বাবা।'

'বিয়ে হয়ে গেছে তোমার?'

'তারপর বিধবাও হয়েছি।'

'সে কি!'

'বিয়ের তিন মাস পরই মারা গেছে লোকটা। সাপের কামড়ে।'

'দুঃখিত।'

'আমি নই। মরেই বেঁচেছে লোকটা। কান ভাঙানি দেয়ার লোকের তো অভাব নেই। নিজেও ভুগেছে আমাকেও ভুগিয়েছে। হাজারটা কথা শুনে এসে হাজার প্রশ্ন করত ও তোমার-আমার সম্পর্ক নিয়ে। তিনটে মাস দোজখ-বাস হয়েছে আমার!'

জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করল রানা।

'বসবে না?'

বসল ওরা সোফায়।

'খাবে না কিছু?' আঁচলে চোখ মুছে বলল সেলিনা।

'খাব? কি খাব?'

'মনে আছে এখানে প্রত্যেক রোববার কি খেতাম আমরা?'

'অনেক দিন আগের কথা। চুমো খেতাম, সন্দেহ নেই, কিন্তু…'

'তোমার প্রিয় খাবারের কথা ভুলে গেছ তুমি!' সেলিনা অবাক।

'কাজের মধ্যে সময় কেটে গেছে, সেলিনা। প্রিয়-অপ্রিয় সব খাবারের কথাই ভুলতে বাধ্য হয়েছি।'

উঠে গিয়ে দেয়াল-আলমারি থেকে একটা আচারের বোয়েম বের করে নিয়ে এল সেলিনা। দু'আঙুলে একটা জলপাই তুলে রানার মুখে পুরে দিল, নিজেও নিল একটা। একদিকের গাল ফুলিয়ে বলল, 'সত্যিই তোমার মনে নেই? এতটা ভুলে যাওয়া সম্ভব!'

টক খেতে ভাল লাগে না রানার, কিন্তু রাশেদের যখন ভাল লাগত—উপায় কি? চোখ কান বুজে কচমচ করে চিবিয়ে গিলে ফেলল। বীচিটা বের করে বলল, 'অপূর্ব!'

'আরেকটা দিই?'

'না, আর না!' চট করে বলল রানা। 'এখন আর অত টক খেতে পারি না।'

খেতে খেতে সেলিনা দেখছিল রানাকে। 'তুমি বেঁচে আছ অথচ মিথ্যে খবর রটিয়েছিলে কেন? কোথায় ছিলে এতদিন?'

'আপাতত তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না, সেলিনা। পরে বলব একদিন।'

'কেন উত্তর দিতে পারবে না? কারণটা কি?' সেলিনার দৃষ্টি অন্তর্ভেদী হয়ে উঠছে।

'বড়জোর এটুকু বলতে পারি, দেশের স্বার্থে অনেক জিনিস গোপন রাখতে হচ্ছে আমাকে। দেশের জন্যে দেশের বাইরে কাজ করছি আমি। সরকারী আদেশ। জানো, বাবা-মাও সবটুকু জানে না।'

'চাচা-চাচীমা তোমাকে দেখেছেন, তাই না?'

'গতকাল থেকে আছি বাড়িতে।'

'বাবা?'

'না।'

'চাচীমা আমার কথা কিছু বলেনি তোমাকে?'

'না।'

'তুমি জানতেও চাওনি?'

'জানতে না চাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে হয়েছিল।' হাসছে রানা।

'চেহারা তোমার বদলায়নি এতটুকু,' সেলিনা বলল। 'কিন্তু আর সবকিছু কেমন যেন বদলে গেছে। এত ধীর স্থির ভাবে কথা বলতে শিখলে কোথায় তুমি, রাশেদ? সর্বক্ষণ দুনিয়ার সব কিছুর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সন্দেহ কোথায় গেল? এতক্ষণের মধ্যে একবারও টাকা চাইলে না! সম্পূর্ণ নতুন মানুষ হয়ে ফিরে এসেছ তুমি। সারাজীবন তোমাকে ভয় করে এসেছি। কিন্তু আজ তোমাকে দেখে ভয় করছে না আমার। রাশেদ! সত্যি, ভাবিনি কোনদিন তুমি এমন মিষ্টি করে হাসবে, ধৈর্য ধরে শুনবে আমার কথা। অদ্ভুত লাগছে তোমাকে আমার, রাশেদ। অদ্ভুত লাগছে! যতই দেখছি ততই যেন মুগ্ধ হচ্ছি আমি।'

অনর্গল বলে চলেছে সেলিনা। 'মনে হচ্ছে তুমি সেই রাশেদ নও। কী সাংঘাতিক বদরাগী ছিলে তুমি! কথায় কথায় মারতে। সব মুখ বুজে সহ্য করতাম। মনে পড়ে, রাশেদ, তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়ি থেকে ফেলে দিয়েছিলে সামান্য একটা কারণে? হাঁটুতে কাঠের টুকরো বিঁধে গিয়েছিল। সেই দাগটা এখনও আছে, জানো?'

'সে-সব কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ো না, প্লীজ, সেলিনা,' রানা বলল। 'ক্ষমা করো আমাকে, যদি পারো। আমি লজ্জিত। আমি সব ভুলে যেতে চাই। তুমি ঠিকই বলেছ, তুমি যে রাশেদকে চিনতে আমি সে-রাশেদ নই—আমূল পরিবর্তন হয়েছে আমার।'

'আচ্ছা!' হঠাৎ প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে খুশিতে দুলে উঠল সেলিনা। 'তোমার শেষ উপহারটার কথা মনে আছে, রাশেদ? কোলকাতা থেকে কিনেছিলে ওটা।'

চোখ খুলে চাইল রানা। সেরেছে!

'কি, মনে নেই?'

'কোলকাতায় কেনা অনেক জিনিসই পাঠিয়েছিলাম অনেককে। ঠিক কি পাঠিয়েছিলাম মনে পড়ছে না তো?'

'মনে পড়ে না, আমার একটা পুতুলঘর ছিল?' সেলিনা অবাক। 'পুতুলঘর সাজাবার জন্যে তুমি একটা পুতুল পাঠিয়েছিলে—নিজেই ভুলে বসে আছ! দাঁড়াও, আলমারিতেই আছে সেটা, আনছি।'

একটা পুতুল বের করে আনল সেলিনা।

রানা বলল, 'হ্যাঁ, এবার মনে পড়েছে।'

'কোলকাতায় যে মেয়েটার সাথে বন্ধুত্ব হয়েছিল তার খবর কি?'

'কোন্ মেয়েটার কথা বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'সে কি! তুমি না লিখেছিলে মেয়েটার কথা। মেয়েটার নাম ধাম কিছু বলোনি। লিখেছিলে: সেলিনা, এখানে একটা মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে আমার। তোমার চেয়েও সুন্দরী। এবং ভাল। মনের আনন্দে ঘুরছি ওর সাথে সারা কোলকাতা শহর।'

'ভুলে গেছি,' বলল রানা। 'অনেক মেয়ের সাথেই বন্ধুত্ব হয়েছিল ওখানে।'

'বুঝতে পারছি।' সেলিনা অভিমানে ঠোঁট ফোলাল। 'বলতে চাও না তার কথা। নাইবা বললে। কিন্তু অমন নিষ্ঠুরভাবে দুঃখ দিতে কেন বলো তো?'

রানা দেখছিল পুতুলটাকে। আট ইঞ্চির মত লম্বা। গায়ে জাপানী কিমোনো। মেড-ইন জাপান, সন্দেহ নেই। কিমোনোর কিনারায় এমব্রয়ডারীর কাজ। পুতুলের পায়ে কালো স্লিপার। কালো মোজা। ছোট ছোট আঙুলের নখগুলো লাল রঙে রাঙা। সোনালী চুল। মাঝখানে সিঁথি।

'রাশেদ।'

চোখ তুলে রানা দেখল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সেলিনা ওর দিকে, 'আবার ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে না তো?'

'ছি, ফাঁকি দেবার কথা বলছ কেন। তবে যেতে হবে আমাকে, সেলিনা। কাল সকালেই।'

'না!' ককিয়ে উঠল যেন সেলিনা।

ম্লান হাসল রানা, 'উপায় নেই, সেলিনা। আমার কাঁধে অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। মা-বাবা-প্রেয়সী সব ছেড়ে থাকতে হবে আমাকে...'

'কতদিন?'

'জানি না।'

'রাশেদ!' সেলিনার চোখে পানি।

'ক্ষমা করো আমাকে, সেলিনা।'

'তোমার ঠিকানাও কি পাব না আমি?'

'দুঃখিত, সেলিনা।'

'আমি...আমি...আত্মহত্যা করব।'

'ছি, সেলিনা।'

'কেন তবে ফিরে এলে! কেন দেখা দিলে?'

হঠাৎ রানার হাত থেকে পুতুলটা কেড়ে নিল সেলিনা। ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের কোণে। ঝপ করে বসল রানার পায়ের কাছে।

'আমাকে ফেলে যেয়ো না, রাশেদ! তুমি জানো না, কি কষ্টে আছি আমি। প্লীজ। একটু দয়া করো!'

কি বলবে, কি করবে বুঝতে পারল না রানা। দু'হাতে ওর দু'কাঁধ ধরে উঁচু করল কিছু একটা সান্ত্বনার কথা বলবে বলে—কোলে উঠে এল সেলিনা। পাগলের মত চুমো খাচ্ছে আর ফোঁপাচ্ছে।

কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পারল রানা। মুহূর্তের জন্যে একটা অপরাধবোধ আড়ষ্ট করে দিল ওকে। কিন্তু বহুদূর এগিয়ে গেছে মেয়েটা...এখন ওকে নিরস্ত করতে হলে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতেই হবে। সেটা যখন সম্ভব নয়, তখন মন থেকে দূর করে দিল সে পাপ-বোধটা।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর হঠাৎ ককিয়ে কেঁদে উঠল সেলিনা।

'সত্যিই চলে যাচ্ছ তুমি, রাশেদ? তোমার ঠিকানাটাও বলবে না আমাকে? তোমাকে ছাড়া বাঁচব কি করে! কথা দিচ্ছি, তোমার কাজে কোন বাধা সৃষ্টি করব না। আমি...'

'কোন প্রশ্ন কোরো না, লক্ষ্মী!' সেলিনার চুলে আঙুল বুলাল রানা। 'কালই কোলকাতায় যেতে হচ্ছে আমাকে। ফিরে এসে সব বলব।'

লম্বা হয়ে ঘাসের উপর শুয়ে তারা দেখছে রানা। হঠাৎ খেয়াল হলো, আরে, অনেক রাত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে! রিস্টওয়াচের লিউমিনাস ডায়ালে চোখ রেখে ধড়মড় করে উঠে বসল ও। সাড়ে দশটা বেজে গেছে এরি মধ্যে।

কেন যেন অস্বস্তি বোধ করল হঠাৎ রানা। কোথাও যেন কোন অঘটন ঘটছে। কোথায়, কি অঘটন ঠিক বুঝতে পারল না সে। কিন্তু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে কিছু একটা নিশ্চয়ই ঘটছে কোথাও ওকে কেন্দ্র করে।

দ্রুত পেরিয়ে গেছে সময়। সেলিনার কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘাসের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছিল তা এখন আর মনে নেই। কুঁড়েমি যা করার আজই করে নাও, নিজেকেই শোনাল রানা, কাল থেকে কাজ, কাজ আর কাজ।

মাঠ পেরিয়ে খিদিরপুর রোডে এসে ট্যাক্সির জন্য দাঁড়াল রানা। তিন মিনিটের মধ্যেই হাত তুলে দাঁড় করাল একটা ট্যাক্সিকে।

হোটেলের সামনে পুলিসের গাড়িটা দূর থেকেই দেখতে পেল রানা। অস্বস্তিবোধটা নড়েচড়ে উঠল বুকের মাঝখানে। পুলিস কেন খাসমহলে?

লবিতে কাউকে দেখল না রানা। সিঁড়ির দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকাল। লিফট নেমে আসছে।

হনুমান নামল লিফট থেকে।

'খু-খু-খুন হয়েছে, স্যা-স্যার!' আতঙ্কিত চোখে দেখছে রানাকে।

'কে খুন হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল রানা শান্ত গলায়।

'সা-সা-সা-সা-সা...'

এত ঘাবড়ে গিয়েছে যে কথা শুরুই করতে পারল না হনুমান। ছাতের দিকে ইঙ্গিত করতে দেখে কথা না বাড়িয়ে লিফটে উঠল রানা।

লিফট তিনতলার করিডরে থামল। অদূরে ম্যানেজার ও তিনজন কনস্টেবলকে দেখা যাচ্ছে। পা বাড়াল রানা। লক্ষ করল ভিড়টা সাতাশ নম্বর কামরার সামনেই।

কোমরে একটা হাত রেখে বকের মত গলা বাড়িয়ে সাতাশ নম্বর রুমের ভিতরটা দেখছিল বুড়ো ম্যানেজার নৃপেণ বাবু। পায়ের শব্দ শুনে তাকাল। রানাকে দেখেই ছুটে এল দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে।

দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। রানার কাঁধে একটা হাত রাখল বুড়ো। ভুরু কুঁচকে চাইল রানা। দ্রুত নামিয়ে নিল বুড়ো হাতটা রানার কাঁধ থেকে। ঢোক গিলল কয়েকবার।

'স্যার, বিপদ!'

'কি বিপদ?' শান্ত প্রশ্ন রানার।

'মহা বিপদ, স্যার, মহা বিপদ!' বুড়ো ঘনঘন মাথা নাড়ল। 'ইন্সপেক্টর বাবু আপনাকে খুঁজছেন।'

'চলুন দেখি।'

কামরাটা উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত। ভিতরে একজন ইন্সপেক্টর, একজন সাব ইন্সপেক্টর, দু'জন কনস্টেবল।

রানার পিছন পিছন বিড় বিড় করতে করতে কামরায় ঢুকল ম্যানেজার, 'ইন্সপেক্টর বাবু!'

'ইনি কে?' ইন্সপেক্টর ম্যানেজারের দিকে না তাকিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছে।

'অতিথি—শ্রীরাশেদুজ্জামান খান।'

ইন্সপেক্টর সামনে এগোল দু'পা, 'আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন?'

রানা বলল, 'হ্যাঁ।' খাটের দিকে চেয়ে দেখল একজন লোক শুয়ে আছে লম্বা হয়ে। মাথা অবধি সাদা চাদরে ঢাকা। নড়ছে না। পা দুটো চাদরের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে।

'আমি সেকশন্ এক, পুলিস স্টেশন আর্মহার্স্ট স্ট্রীটের ইন্সপেক্টর জগদীশ ভট্ট। আপনার পাসপোর্টটা দেখতে পারি?'

'পারেন।' রানা বলল। 'কিন্তু কেন?'

'আপনার কামরায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে...'

ইন্সপেক্টরকে থামিয়ে দিয়ে বিরক্তির সাথে বলল রানা, 'কি দুর্ঘটনা?'

'বলছি,' হাত বাড়ালেন ভট্ট, 'পাসপোর্ট, প্লীজ।'

কোটের পকেট থেকে পাসপোর্ট বের করে ইন্সপেক্টরের হাতে দিল রানা। আলোর নিচে গিয়ে দাঁড়াল সে।

সবাই লক্ষ করছে রানাকে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল রানা কামরার চারদিকে। পিছনের জানালার উপর যে ফ্লাওয়ার ভাসটা ছিল সেটা দেখতে পেল না ও। নেই কেন? খাটের নিচে একটা প্রকাণ্ড লেদার সুটকেস দেখা যাচ্ছে। কার ওটা? বিছানার চাদরটা বদলে ফেলা হয়েছে। কেন? টেবিলের উপর একটা রিস্টওয়াচ, একটা নোটবই, একটা মানিব্যাগ, এক কোণে নকশা কাটা সাদা একটা রুমাল—কার ওগুলো?

বিছানার উপর একজন লোক। সম্ভবত বেঁচে নেই। কে ও? এ কামরায় কেন?

দু'পা সামনে এগিয়ে এল ইন্সপেক্টর ভট্ট, 'আপনি দেখছি বাংলাদেশ থেকে আজ সন্ধের দিকে কোলকাতায় এসেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'পাসপোর্টে লেখা রয়েছে আপনি একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট।'

'ঠিকই লেখা আছে।' রানা বলল। 'ঢাকার একটা অ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে চাকরি করি আমি।'

'কোলকাতায় আসার কারণ?'

'ছুটি পাওনা ছিল। বেড়াতে এসেছি।'

'এই প্রথম কোলকাতায় বেড়াতে এসেছেন সম্ভবত?'

'না। যুদ্ধের সময় ছিলাম এখানে কয়েকদিন।'

'তাই নাকি!'

'মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলা ক্যাম্পে ছিলাম আমি। ছুটি পেয়ে বেড়াতে এসেছিলাম।'

'এবারও আসার কারণ কি শুধুই বেড়ানো?'

'শুধুই বেড়ানো। একাত্তর সালে এসে কোলকাতার সবটুকু দেখা হয়নি। এবার এসেছি ঘুরে ফিরে দেখতে। গতবারও এই হোটেলে উঠেছিলাম আমি।'

'বন্ধু-বান্ধবের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবেন নিশ্চয়ই?'

'কোথায় বন্ধু-বান্ধব? কয়েকদিন মাত্র ছিলাম। বন্ধুত্ব হয়নি কারও সাথে।'

ইন্সপেক্টর নিজের উপরই যেন বিরক্ত হয়ে উঠল। রানার দিকে তাকিয়ে কি যেন চিন্তা করল সে। খানিকপর মাথা দুলিয়ে শব্দ করল, 'হুঁ।' সরে গিয়ে বিছানার কাছে দাঁড়াল। 'দেখুন তো, মি. রাশেদ, এই ভদ্রলোককে চেনেন কিনা?'

ইন্সপেক্টর ভট্ট বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটার মুখ থেকে চাদর সরিয়ে ফেলল।

দু'হাতে চোখ ঢাকল ম্যানেজার।

পা বাড়িয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। অপরিচিত মুখ। বয়স হবে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। চাঁদিতে টাক। চোখ দুটো বোজা। যেন ঘুমুচ্ছে অঘোরে। ডাক দিলেই উঠে বসবে। কপালে ফুটো।

বেঁচে নেই লোকটা। কানের কাছে হাইড্রোজেন বোমা ফাটলেও জাগবে না।

'চিনি না ওকে,' রানা বলল। 'কে ও? আমার কামরায় কেন?'

ইন্সপেক্টর ভট্ট মুখটা আবার চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। কথা বলতে শুরু করল এতক্ষণে সবাই। ইন্সপেক্টর ভট্ট বলল, 'কামরাটা এখন আর আপনার নয়, মি. রাশেদ।'

'তাই নাকি! কেন শুনি?'

বুড়ো ম্যানেজারের দিকে আঙুল তুলল ভট্ট, 'মি. রাশেদকে ব্যাখ্যা করে বলুন কেন আপনি ওর রূম অন্য একজনকে দিয়েছিলেন।'

বুড়ো নৃপেণ বলল, 'আটষট্টি নম্বর কামরার সংসারটা অপেক্ষাকৃত সস্তা হোটেলে চলে গেল আজ রাতে, এই আটটার দিকে।' তাকাল সে রানার দিকে সমর্থন পাবার জন্যে। 'স্যার অভিলাষ করেছিলেন আটষট্টি নম্বর খালি হলে তাঁকে যেন দেয়া হয়। সুতরাং...'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আমার কাপড়-চোপড়, ব্যাগ?'

'আটষট্টি নম্বরে সব রেখে এসেছে হনুমান।' বুড়ো নৃপেণ জানাল।

'তারপর রাত ন'টা বাজল। জিতেন বাবুর আবির্ভাব হলো সোয়া ন'টায়। আর কোন কামরা খালি ছিল না, তাই, সাতাশ নম্বরটাই নবাগত অতিথিকে দিলুম—কোথায় আমার অপরাধ আপনারাই বলুন বিচার করে!'

ইন্সপেক্টর ভট্ট বলে উঠলেন, 'জিতেন বাবুর নোটবই দেখে মনে হচ্ছে তিনি ফ্লাইং বিজনেসম্যান। হুগলিতে বাড়ি। মাসে এক দু'বার কোলকাতায় আসতেন।'

'এবং যখনই আসতেন আমাদের হোটেল ছাড়া আর কোথাও পদার্পণ করতেন না।' বুড়ো নৃপেণের মন্তব্য।

ইন্সপেক্টর ভট্ট ভুলেও চোখ সরায়নি রানার উপর থেকে। 'আপনি শিওর জিতেন বাবুকে কখনও দেখেননি?'

'শিওর।'

খোলা জানালার দিকে পা বাড়াল ভট্ট, 'আমার বিশ্বাস আততায়ী এই জানালা পথে কামরায় ঢুকে গুলি করেছে।'

'জানালার নিচে পানির পাইপ এবং কার্নিস দেখেছি আগেই আমি।' রানা ইন্সপেক্টরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। 'নিচে থেকে বা পাশের কোন রুম থেকে এ রুমে আসা কঠিন কিছু নয়।' ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে তাকাল রানা। অন্ধকার। ফ্লাওয়ার ভাসটা নিচে পড়ে থাকলেও এখন দেখা যাবে না। আরও একটু ঝুঁকল রানা। পাশের কামরার জানালায়ও একটা ভাস দেখেছিল ও।

নেই সেটা।

ইন্সপেক্টর চিন্তিত মুখে লক্ষ করছিল রানাকে। হঠাৎ মন্তব্য করল, 'মশায় দেখছি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখেন?'

'আমি একজন আর্টিস্ট, ইন্সপেক্টর,' বলল রানা। 'তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই তো আমার সম্বল।'

'তা বটে।' ইন্সপেক্টর চারমিনার ধরাল একটা। 'কতদিন থাকছেন কোলকাতায়?'

'কয়েক হপ্তা, সম্ভবত।'

'আবার হয়তো কথা বলতে হবে আপনার সাথে।'

'যখন ইচ্ছে আসবেন।'

'এর মধ্যে আপনি যদি নতুন কিছু আবিষ্কার করেন তাহলে দয়া করে খবর দেবেন আমাকে। কেমন?' ভট্ট হঠাৎ খাদে নামিয়ে আনল গলা, যাতে আর কেউ শুনতে না পায়, 'ধরুন, ফ্লাওয়ার ভাস দুটো নেই লক্ষ্য করেছেন আপনি—এরকম আর কিছু যদি চোখে পড়ে…,' ভট্ট থামল। বলল, 'দুটো জানালার ভাসই খুনী ফেলে দিয়েছে নিচের বাগানে। আমার লোকেরা পেয়েছে। খুনী সম্ভবত পাশের কামরা থেকেই এ কামরায় এসেছিল।'

'গুলির শব্দ শোনেনি কেউ?' জানতে চাইল রানা।

'করিডরের উল্টোদিকের কামরায় এক দম্পতি থাকেন। ভদ্রলোক বাইরে ছিলেন। ভদ্রমহিলা গুলির শব্দ শুনে ফোনে ম্যানেজারকে ডাকেন। ম্যানেজার ছুটে এসে জিতেন বাবুর নাম ধরে ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে অবশেষে

পুলিসে খবর দেন। আমরা এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকি। পিস্তলটা পাওয়া যায়নি।' ইন্সপেক্টর একটু বিরতি নিয়ে হাতটা বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে, 'আপনার পাসপোর্ট, মি. রাশেদ।'

'ধন্যবাদ।'

ইন্সপেক্টর বলল, 'নৃপেণ বাবু, আপনার অতিথিকে আটষট্টি নম্বরে পৌঁছে দিন এবার।'

'অবশ্যই! অবশ্যই!' বুড়ো হাঁক ছাড়ল, 'হনুমান!'

'বা-বু।'

'স্যারকে নিয়ে যা আটষট্টি নম্বরে।'

'গুড নাইট, মি. রাশেদ।' ইন্সপেক্টর ভট্ট এই প্রথম হাসল রানার দিকে চেয়ে, 'আবার আমাদের দেখা হবে।'

'আপনি চাইলেই হবে।' বেরিয়ে এল রানা সাতাশ নম্বর কামরা ছেড়ে।

ছ'তলার আটষট্টি নম্বর কামরাটা অপেক্ষাকৃত বড়সড়। দু'দিকে ব্যালকনি। কিন্তু নিচে বা আশপাশ থেকে কারও পক্ষে ওঠা সম্ভব না।

'সুধীর বাবু ফেরেননি আর তারপর, না?'

'না, স্যা-স্যার।'

'ঠিক আছে, যাও তুমি।'

হনুমান চলে যেতে কোট খুলে ফেলল রানা। শোলডার হোলস্টার খুলতে খুলতে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল একাধিকবার। ইন্সপেক্টর ওর বডি সার্চ করলেই ধরা পড়ে যেত ও। মহা ফ্যাসাদে পড়ে যেত তাহলে। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, গড়ের মাঠে অস্বস্তিবোধের কথাটা। মন অকারণে গায় না। একজন মানুষ খুন হয়েছে ওর বিছানায়। যে বিছানায় ওরই শুয়ে থাকার কথা।

ভুল হয়েছে আততায়ীর।

কোন সন্দেহ নেই, জিতেন বাবুকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়া হয়নি। ছোঁড়া হয়েছে রাশেদকে লক্ষ্য করে। এবং ও স্বয়ং এখন রাশেদুজ্জামান। বিছানায় ও আছে মনে করেই গুলি ছুঁড়েছে আততায়ী।

কিন্তু রাশেদকে খুন করতে চাইছে কেন?

কে?

চার

মেঘ করেছে আকাশে। বৃষ্টি হবে নাকি!

সকালের কাগজে জিতেন বাবুর হত্যার খবর নেই দেখে অস্বস্তি বোধ করল রানা। ভট্ট কি ইচ্ছে করেই খবরটা প্রেসকে জানায়নি?

ব্রেকফাস্ট সারতে সারতে সারাদিনের প্রোগ্রাম তৈরি করল রানা মনে মনে। সুধীরকে প্রশ্ন করতে হবে। সে কি চিনতে পেরেছে ওকে? সেই কি

কাউকে জানিয়েছে যে রাশেদ আবার ফিরে এসেছে কোলকাতায়? নাকি রাস্তায় চিনতে পারল কেউ?

আর্ট গ্যালারিগুলোয় ঢুঁ মারতে হবে ওকে। রাশেদ আর্টিস্ট ছিল। কোলকাতায় থাকার সময় নিশ্চয়ই সে আর্ট গ্যালারিতে যাওয়া আসা করেছে। কেউ হয়তো চেহারাটা দেখলে চিনতেও পারে। আর আছে সেই ফটোটা। সম্ভবত কোন আর্ট গ্যালারিতে দাঁড়িয়েই তুলিয়েছিল রাশেদ। ফটোর পিছনের পেইন্টিংটা পেয়েও যেতে পারে ও কোথাও।

টেলিফোনটা তুলল রানা, 'সুধীর বাবুকে দিন।'

অপরিচিত কণ্ঠ বলল, 'উনি নেই।'

'নেই মানে?'

'আজ উনি আসবেন না। ফোনে জানিয়েছেন। ইনফ্লুয়েঞ্জা।'

'নৃপেণ বাবুকে দিন তাহলে।'

'আদেশ করুন, স্যার,' নৃপেণ বাবুর নাটুকে গলা। 'কোন অসুবিধে...'

'একটু উপরে আসতে পারবেন? পাঁচ মিনিটের জন্যে?'

'অবশ্যই! এক্ষুণি আসতে হবে?'

'এলে ভাল হয়।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। দ্রুত চিন্তা করছে সে। সুধীর কি পুলিসকে এড়াতে চায়? সত্যিই কি সে অসুস্থ?

সুধীরই হয়তো কাউকে খবর দিয়েছে। রাশেদ ফিরে এসেছে, সুধীরের কাছ থেকে এ খবর পেয়ে হয়তো খুন করার সিদ্ধান্ত নেয় আততায়ী। রূম নম্বরটাও দিয়েছে সে-ই। জানত না নৃপেণ বাবু রানার কামরা অন্য একজনকে দিয়ে দিয়েছে ইতোমধ্যে। অন্ধকারে আততায়ী রাশেদ মনে করে গুলি করেছে জিতেন বাবুকে। সুধীর হয়তো এখনও আসল ঘটনা জানতে পারেনি। খবরের কাগজে ছাপা হয়নি যখন, জানবার সম্ভাবনা কম।

সুধীরের সাথে যেভাবেই হোক কথা বলতে হবে।

নক হলো দরজায়।

'আসুন।'

হাসিমুখে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল বৃদ্ধ ম্যানেজার। কোমরে হাত।

চেয়ারের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে চাইতে দেখে মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত করল রানা, 'বসুন।'

মৃদু একটা আর্তনাদ করে বসে পড়ল ম্যানেজার। 'আজ্ঞা করুন?'

'কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই আপনাকে, নৃপেণ বাবু।'

'কালকের সেই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে নিশ্চয়ই?'

'খুনী ধরা পড়েছে?'

'না। দারোগা বাবুর ধারণা খুনী পাশের কামরা থেকে এসেছিল।'

'কারণ?'

'পাশের কামরায় অ্যাশট্রেতে সিগারেটের টুকরো পাওয়া গেছে।'

'কার কামরা ওটা?'

'ঘোষাল বাবুর। এ হোটেলের স্থায়ী অতিথি। বিড়ি সিগারেট খান না।'

'গতরাতে কোথায় ছিলেন তিনি?'

'চব্বিশ পরগনায়। সকালে ফোন পেয়ে হোটেল থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি। ছোট ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ। আগামীকাল সৎকার।'

'সুধীর বাবু অসুস্থ, না?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'থাকেন কোথায় ভদ্রলোক?'

'পার্ক সার্কাসের ওদিকে। ওয়ালিউল্লা লেনে। গো-মাংস বিক্রি হয় এমন দুটো পাশাপাশি দোকানের ডান দিকে একটা ফ্ল্যাট বাড়ির তিন তলায় থাকে শুনেছিলাম।'

'জিতেন বাবুর হত্যা সম্পর্কে নতুন যে কোন খবর পেতে চাই আমি। ঘটনাটা আমার কামরায় ঘটেছে বলে আমি আগ্রহী।'

'বিলক্ষণ। শুনেছিলাম জিতেন বাবুর স্ত্রীকে পুলিস এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।'

'কেন?'

'জেরা করবে হয়তো। পুলিসের আর কি কাজ?'

'জিতেন বাবুর খুনের কারণ আবিষ্কার করতে পেরেছে পুলিস?'

'পারেনি। হয়তো পারবেও না।'

'কেন?'

'আমার ধারণা এটা প্রেমঘটিত ব্যাপার। জিতেন বাবু গোপনে কোলকাতায় রক্ষিতা পুষতেন। পাশের কামরায় সে-ই অপেক্ষায় ছিল নির্দিষ্ট সময়ে।'

'একটা মেয়ের পক্ষে কার্নিস বেয়ে এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাওয়া সম্ভব?'

'এমনও তো হতে পারে যে মেয়েটা দরজায় এসে জিতেন বাবুকে ডেকেছিল এবং জিতেন বাবু সানন্দে দরজা খুলে দিয়েছিলেন?'

'কিন্তু পুলিস বলছে খুনী জানালা দিয়েই ঢুকেছে।'

'পুলিস অমন কত কথাই তো বলে।'

'আর সিগারেট? সিগারেটের টুকরো পাওয়া গেছে পাশের ঘরে।'

'এতে একটা কথাই প্রমাণ হয়—মহিলা ধূমপায়ী ছিল।' রানাকে হাসতে দেখে উত্তেজিত হয়ে উঠল ম্যানেজার। 'কেসটার যদি সুরাহা হয়, দেখবেন, আমার সমাধানের সাথে মিলে যাবে অক্ষরে অক্ষরে। নিজের চোখেই দেখতে পাবেন।'

পার্ক সার্কাসে ট্যাক্সি থেকে নেমে ওয়ালিউল্লা লেনে ঢুকে পড়ল রানা। মাত্র একজন দোকানদারকে জিজ্ঞেস করতেই চেনা গেল মাংসের জোড়া দোকান।

দোকান দুটোই বন্ধ। মিটলেস ডে। ওখানে দাঁড়িয়ে অ্যাপার্টমেন্ট

হাউসটা কোথায় জিজ্ঞেস করতে হলো না কাউকে। অদূরেই চারতলা বাড়িটা। দেখেই চিনল রানা। উঠে এল তেতলায়। দরজা বন্ধ।

নক করল রানা। পকেট থেকে বের করল ব্র্যান্ডির বোতলটা। সুধীর মদ খায়। একবোতল ভেট এনেছে তাই।

'কে?' বেশ কিছুক্ষণ নক করার পর প্রশ্ন এল ভিতর থেকে। সুধীরের গলা।

জবাব না দিয়ে আবার নক করল রানা। অপেক্ষা করে দেখা যাক কি হয়। পরিচয় দিলে নাও খুলতে পারে দরজা।

কিন্তু একবার সাড়া দিয়েই চুপ করে গেছে সুধীর। ভিতরে নড়াচড়ারও শব্দ নেই। সুধীর দরজার খিল খুলবে না, বুঝতে পেরে আবার নক করল।

আবার দেরি করে জিজ্ঞেস করল সুধীর, 'কে?'

'সুধীর?'

'কে আপনি?' দরজা খুলছে না সুধীর। খুলবে বলেও মনে হয় না। বুঝতে পারল রানা লোকটা ভয়ে জড়সড় হয়ে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে ঘরের ভিতর। গলা শুনেই বোঝা যাচ্ছে, আতঙ্কিত সে। কারণ কি?

'আপনি!' হঠাৎ সুধীর যেন সাপ দেখে চমকে উঠেছে।

ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পারল রানা। কী হোল দিয়ে সুধীর দেখে ফেলেছে ওকে।

'ঠাণ্ডা লেগেছে শুনে আপনার জন্য এক বোতল ব্র্যান্ডি এনেছি, সুধীর বাবু। দরজাটা খুলুন।'

'চলে যান!'

'কথা আছে আপনার সাথে, সুধীর বাবু। দরজাটা খুলুন।'

'না!' চাপা কণ্ঠে বলল সুধীর।

'ভয়ের কিছু নেই। আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না…'

'বলছি তো, চলে যান দয়া করে!' ফিসফিস করে কথা বলছে সুধীর, 'একা থাকতে দিন আমাকে।'

'আপনাদের হোটেলে একজন লোক গতরাতে খুন হয়েছে। আপনি তাকে চেনেন। জিতেন বাবু।'

'জিতেন বাবু! তিনি!' সুধীর যেন বিশ্বাস করতে পারছে না কথাটা।

'হ্যাঁ।' বলল রানা। 'দরজাটা খুলুন। দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে। কোন ভয় নেই।'

'না! চলে যান আপনি।' গলা কাঁপছে সুধীরের।

'আপনি চান আমি পুলিসকে সব বলি?'

'পুলিস!'

'হ্যাঁ, পুলিস।' কঠিন হলো রানার গলা। 'বলব পুলিসকে যে আপনি আমার কথা এমন একজনকে জানিয়েছেন যে আমাকে খুন করতে চায়? একাত্তর সালে আমি যখন এখানে প্রথম আসি তখনকার সাথে এ ব্যাপারটা জড়িত।' কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিল রানা, তারপর বলল, 'কে খুন করতে

চায় আমাকে, সুধীর বাবু? তার পরিচয় জানার জন্যে প্রচুর টাকা খরচ করতে রাজি আমি। আপনি জানেন তার পরিচয়। হাজার, দু'হাজার যা চাইবেন দেব। শুধু কথা বলুন আমার সাথে। যা জানেন সব শুনতে চাই আমি।'

'না। এখন না।'

'বেশ। যাচ্ছি পুলিসের কাছেই। আমার সন্দেহের কথাটা জানিয়ে দিই।'

'এক কাজ করুন।' সুধীর বলল।

'কি?'

'পরে আসুন। মেয়েটাকে বিদায় করে নিই।'

অর্থাৎ লোকটা একা নয়। ওর পিছনে খুনী লেলিয়ে দিয়ে মেয়ে নিয়ে শুয়ে আছে নিজের ঘরে।

'পরে কখন?'

'দু'ঘণ্টা পর।'

রিস্টওয়াচের দিকে তাকাল রানা, 'দু'ঘণ্টা পর? বারোটায়?'

'হ্যাঁ।'

'তখন সব কথা বলবেন?'

'বলব।'

'বোতলটা রেখে যাচ্ছি দরজার পাশে।'

'আচ্ছা।'

নিচে নেমে রানা দেখল বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। চট করে ভেবে নিল সে, কাছেপিঠেই কোথাও অপেক্ষা করবে কিনা। সিদ্ধান্ত নিল, তার দরকার নেই। সুধীর অপরাধী না হলে দু'ঘণ্টা পর ঠিকই পাওয়া যাবে ওকে এখানে। যদি অপরাধী হয়, পালাবে; যদি নাও পালায়, কথা বের করা যাবে না ওর কাছ থেকে জোরজুলুম ছাড়া। পালিয়ে গেলেও প্রয়োজন হলে ওকে খুঁজে বের করা কঠিন হবে না পুলিসের পক্ষে। আপাতত পুলিসের সাহায্য নিতে চায় না রানা, লোকটা অপরাধী কিনা এটুকু জানতে পারলেই যথেষ্ট। দরকার পড়লে পরে জানানো যাবে ভট্টকে। এখন কাজের শুরুতে বাজে ঝামেলা যত কম হয় ততই ভাল কিন্তু দু'দুটো ঘণ্টা সময় কোথায় কাটানো যায়? আর্ট গ্যালারি-গুলোয় গেলে মন্দ হয় না।

মোড়ে এসে ট্যাক্সি নিল রানা। মহাত্মা গান্ধী রোডেই দুটো আর্ট গ্যালারি দেখেছে ও। হোটেল খাসমহল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। কাছে যখন, রাশেদ হয়তো এ দুটোয় একাধিকবার গিয়ে থাকতে পারে।

ট্যাক্সি বেনিয়াপুকুর রোডে পৌঁছুতে টের পেল রানা অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে।

প্রাইভেট কার নয়, একটা ট্যাক্সি। অনেকক্ষণ আগে থেকেই অনুসরণ করছে ওকে। পার্ক সার্কাসে যাবার সময় ট্যাক্সিটাকে দেখেছিল রানা অনেকটা দূরত্ব রেখে পিছন পিছন আসতে। সন্দেহ জাগেনি ওর। কিন্তু নাম্বারটা চোখে পড়েছিল।

ড্রাইভারকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। পাশে কেউ নেই। পিছনের সীটে

কেউ আছে কিনা ঠিক দেখতে পাচ্ছে না রানা। কালো মত কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। অনেকটা দূর বলে বোঝা যাচ্ছে না পরিষ্কার।

লোয়ার সার্কুলার রোডে এসেও পিছু ছাড়ল না ট্যাক্সিটা। মহাত্মা গান্ধী রোডে ঢুকল রানার ট্যাক্সি। ট্রাফিক জ্যাম। ট্যাক্সি থেকে নেমে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ওটাকে আর দেখতে পেল না রানা।

একে বলে আর্ট গ্যালারি? ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে এল রানা দুটো গ্যালারি থেকেই। গ্যালারি নয়, দোকান। দোকানদারের উপদ্রব এককথায় সহ্যের বাইরে। রানা যে ছবির সামনেই একটু দাঁড়িয়েছে সেই ছবিরই অযাচিত প্রশংসা, গুণগান শুরু করেছে কর্মচারীরা। তারপর কেনার জন্য অনুরোধ। নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে। কিনব না, পছন্দ হয়নি বললেও কানে তোলে না কথা। গছিয়ে দেবার সে কি প্রাণান্তকর চেষ্টা। স্রেফ খদ্দের হিসেবে নিয়েছে ওরা ওকে, কোন রকম পূর্ব পরিচিতির লক্ষণ টের পাওয়া গেল না। কোন সূত্র না।

দুটো গ্যালারিই প্রাইভেট এবং আকারে ছোট। বড়গুলোয় যেতে হবে, ভাবল রানা।

মেঘ কেটে গেছে। রৌদ্রোজ্জ্বল চারদিক। হাঁটতে খারাপ না লাগলেও ভিড়ের ভয়ে ট্যাক্সি নিল রানা।

চৌরঙ্গীতে নেমে একটা বারে বসল সে। গলাটা ভিজিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল আবার। পঁচিশ গজ হাঁটতেই সাইন বোর্ডটা চোখে পড়ল: কলেজ অভ আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট্।

প্রকাণ্ড বাগান সামনে। ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকছে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, বসে। ভ্যানগগ, গগাঁ, পিকাসো হওয়ার আশা ওদের বুকে। শেষ পর্যন্ত হবে হয়তো স্কুলের ড্রইংটীচার। ব্যস্ত সবাই। কেউ লক্ষ্য করল না রানাকে। বিল্ডিংটা আরও খানিক দূরে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করল না রানা। খানিকক্ষণ শিক্ষানবিশদের আশপাশে ঘুরঘুর করে তাদের প্রতিভার নমুনা চাক্ষুষ করল ও।

কলেজের করিডরে ছোট একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। তীর চিহ্ন আঁকা। দোতলার দিকে নির্দেশ করছে: গ্যালারি।

দোতলার সবটুকুই গ্যালারি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। খুব কম দর্শক। দর্শকদের আসার সময় এটা নয় অবশ্য। মেয়েরা ঘুরে ফিরে দেখছে ছবি। সংখ্যায় তারাই বেশি।

যামিনী রায়ের অয়েল পেইন্টিং, নন্দলালের স্কেচ ছাড়িয়ে তরুণদের দিকে এগোল সে। আট নম্বর কামরায় ঢুকতেই চোখে পড়ল ছবিটা। অয়েল। নিচে লেখা: বিক্রির জন্য নয়। টাইটেল, আমার বোন। পাঞ্জাবী সেনারা রেপ করছে। দারুণ হাত শিল্পীর। অদ্ভুত ফুটেছে ছবিটা। জীবন্ত মনে হচ্ছে ছবির সব ক'টা চরিত্রকে। মেয়েটা হাঁ করে আছে। খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর রানার মনে হলো মেয়েটার চিৎকার ও পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছে। ঋণী বোধ করল রানা শিল্পীর কাছে।

রাশেদের ফটোর পিছনে যে পেইন্টিংটা রয়েছে এ ছবি সেটা নয়। সাবজেক্ট একই। একজন মুসলমানের আঁকা। ওমর ফারুক।

'সুন্দর ছবি, তাই না?' পাশ থেকে একটা মেয়ে কথা বলে উঠল, 'আপনাদের দেশেরই এক শিল্পীর আঁকা। ছবির মেয়েটি ওর বোন। শিল্পী নিজেও পাকিস্তানী সেনাদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।'

মেয়েটাকে দেখছিল রানা। কথাগুলো রানার উদ্দেশেই বলা। কিন্তু তাকিয়ে আছে ছবিটার দিকে। লাল পেড়ে সাদা শাড়ি। গায়ের রঙ শ্যামলা কিন্তু লাবণ্য প্রচুর। সুন্দর ছোট নাক, চোখ দুটো অনেকদূর অবধি চেরা। এলোচুল। আঁকিয়ে, কোন সন্দেহ নেই।

'আপনি...'

'এই কলেজে পড়াই। ললিতা নাগ।' রানার মুখের দিকে চেয়ে হাসল মেয়েটা। মাপা মিষ্টি হাসি।

'বাংলাদেশ থেকে এসেছি জানলেন কিভাবে?'

'পোশাক দেখে,' বলল ললিতা। 'বিদেশী কাপড় ভারত আমদানি করে না।' ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল একবার। 'এই কামরার সব ছবিই আপনাদের মুক্তিযুদ্ধের উপর।'

'তাই তো দেখছি। কিন্তু আমি যে ছবিটা খুঁজছি সেটা পাচ্ছি না। যুদ্ধের সময় কোলকাতায় ছুটি কাটাতে এসেছিলাম পাঁচ দিনের জন্যে,' পা বাড়াল রানা। 'তখন ছবিটা কোন গ্যালারিতে দেখেছিলাম। ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে ফটো তুলেছিলাম একটা। সেটা যে কোন্ গ্যালারি তা এখন আর মনে নেই।' রানা টের পাচ্ছে মেয়েটা ওর পিছন পিছন আসছে। দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখতে দেখতে সামনে এগোচ্ছে রানা।

'আপনি মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন বুঝি?'

'ছিলাম।' ছবির প্রসঙ্গটা আবার তুলল রানা। 'তখনই ছবিটা কেনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু যুদ্ধ চলছিল... কাজেই... যুদ্ধের পর নানা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ ছুটি পেয়ে গেলাম, ভাবলাম দেখি ছবিটা পাওয়া যায় কিনা।'

'শিল্পীর নাম মনে আছে আপনার?' মেয়েটা বলল, 'আমি হয়তো সাহায্য করতে পারতাম আপনাকে খোঁজার ব্যাপারে।'

'না, মনে নেই।'

'তবে তো মুশকিল...'

'জানি পাওয়ার আশা নেই। তবু।' রানা দাঁড়াল। কামরার সব কটা ছবিই দেখা হয়ে গেছে। নেই সেটা এখানে।

'যে ফটোটা তুলেছিলাম সেটা আমার কাছে আছে,' বলল রানা। 'ফটোটার পিছনে পরিষ্কার দেখা যায় অয়েল পেইন্টিংটা...'

'ওমা, দীপালি তুই! আয় আয়।' রানার কাছে থেকে সরে গেল ললিতা। কোটের পকেট থেকে খালি হাতটা বের করে আনল রানা, ফটো বের করে লাভ নেই আর। বান্ধবীকে পেয়ে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে ললিতা।

একটা মেয়ে এগিয়ে আসছে। এগিয়ে গিয়ে ললিতা তার একটা হাত

ধরল, ফিসফিস করে কথাটা বললেও কানে গেল রানার, 'মাইরী বলছি! তুই আজ আগুনের মত জ্বলছিস, দীপি।'

'তুই বুঝি ঘুঁটের মত পুড়ছিস?' দীপালি চাপা গলায় বলল, 'লেডী কিলারটা কেরে?'

'ছি ছি, কি যা তা বলছিস!' ললিতার পরবর্তী কথাগুলো কানে গেল না রানার।

পাশের কামরায় চলে গেল রানা। মিনিট তিনেক পর ললিতা ও দীপালি এসে ঢুকল এ ঘরে। বেরিয়ে আসছিল রানা, থমকে দাঁড়াল দীপালির চোখে চোখ পড়তেই। ধড়াস করে উঠল ওর বুকের ভিতরটা।

হ্যাঁ, মেয়েটা সুন্দরী। হলুদ লাল পেড়ে শাড়িতে দেবীর মত লাগছে। শাড়ি কালো পেড়ে বা সবুজ পেড়ে হলেও এর চেয়ে কম লাগত না। শাড়ি একেবারে না থাকলে আরও ভাল লাগত। আশ্চর্য গড়ন মেয়েটার। বয়স তেইশ কি চব্বিশ। চোখে বিদ্যুৎ।

'আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই…' রানার মুগ্ধ দৃষ্টি চোখ এড়ায়নি ললিতার। তাই ওর গলায় কৌতুক।

রানা হাসল। 'আমার নাম রাশেদুজ্জামান খান। বাংলাদেশ থেকে আপনাদের কোলকাতা দেখতে এসেছি।'

'দীপালি রায়…নমস্কার।' হাত একত্রিত করল দীপালি বুকের কাছে।

'দীপালি আপনাকে সাহায্য করতে পারবে, মি. খান। ওর প্রশংসা করছি না, আর্টের পাকা সমঝদার—আমরা সবাই ওকে ঈর্ষা করি। ঈর্ষা অবশ্য আরও একটা কারণে করি…'

'ললি!' কৃত্রিম শাসানি দীপালির চোখে।

'চলি ভাই,' ললিতা যাবার জন্য পা বাড়াল। 'খাঁ সাহেবকে তোর জিম্মায় রেখে যাচ্ছি। সাহায্য করিস কিন্তু!' রানার দিকে তাকাল সে, 'ওকে বলুন। ফটোটাও দেখান। ও খুঁজে বের করে ফেলবে ঠিক। সব আর্ট গ্যালারির কালেকশন সম্পর্কে বিস্তারিত জানে ও।'

'কেন বাজে বকিস!' দীপালি তাকাল রানার দিকে, 'ওর কথা বিশ্বাস করলে ঠকবেন, মি. রাশেদ।'

'চলি রে।' দীপালিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বিদ্ধ করে বেরিয়ে গেল ললিতা কামরা থেকে।

'আপনিও তো শিল্পী, তাই না?' জানতে চাইল রানা।

'ছিলাম কোন কালে, এখন আঁকি-টাকি না। সমস্যাটা কি বলুন তো? কি খুঁজছেন?'

সব বলল রানা।

'ফটোটা দেখি?'

ফটোটা দেখার সময় কোন ভাবই প্রকাশ পেল না দীপালির মুখে। অনেকক্ষণ ধরে দেখল ও।

'কতদিন আগে তুলেছেন এ ফটো?'

'একাত্তরে। অক্টোবরের ছয় থেকে দশ তারিখের মধ্যে।'

'নির্দিষ্ট দিনও মনে নেই বুঝি?'

'না।' বলল রানা। 'পাঁচদিনের ছুটি নিয়ে এসেছিলাম এখানে। কিভাবে দিনগুলো কেটেছে এখন আর কিছু মনে নেই।'

ফটোর দিকেই চোখ রেখে বলল, 'ছবিটা দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না। তবে কোলকাতার কোন গ্যালারিতে যখন দেখেছেন, এর খোঁজ আপনাকে দিতে পারব। সময় লাগবে হয়তো দু'দিন। আচ্ছা, ছবিটা কেন খুঁজছেন বলুন দেখি? এর চেয়ে ভাল ছবিও তো প্রচুর আছে।'

'তা আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু নিজের ফটোর পিছনে ছবিটাকে দেখতে দেখতে এর প্রেমে পড়ে গেছি। ইদানীং নিজের চেহারা দেখি না। দেখি ওই ছবিটাকে। ফটোর ছবিটা ছোট এবং অস্পষ্ট। মূল ছবিটা পেলে ধন্য মনে করব নিজেকে।'

দীপালি হাসল, 'আপনিও কি শিল্পী?'

'কমার্শিয়াল।'

'তা হোক। শিল্পী তো। শিল্পী না হলে একটা সামান্য ছবির জন্য এতদূর আসতেন না।'

'শুধু ছবিটার জন্যেই যে কোলকাতায় এসেছি তা ঠিক নয়,' বলল রানা। 'আরও কাজ আছে।'

ওর কাজের বিষয়ে কোন আগ্রহ প্রকাশ করল না দীপালি।

রানা যেচে পড়ে জানাল, 'বাজে একটা হোটেলে উঠেছি এসে। খাসমহল। টপ ফ্লোর, সিক্সটি এইট। কোথায় দেখা পাব আবার আপনার?'

দীপালিকে অসহায় দেখাল একটু, 'কতটুকু সাহায্য করতে পারব জানি না। আমি একা থাকি একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে। নাইন বাই সেভেন, থিয়েটার রোড। সকাল এগারোটা অবধি থাকি। ফিরি আড়াইটা তিনটেয়। ছ'টার আগে বেরোই না। ফিরি এগারোটার মধ্যে।'

বলব কি বলব না করতে করতে প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলল রানা। 'কাল দুপুরে ফিরপোজ রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেলে কেমন হয়? আপনি সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন, তার সম্মানে?'

শব্দ করে হাসল দীপালি।

রিস্টওয়াচ দেখল রানা। হাসি থামতে জিজ্ঞেস করল, 'দুপুর দেড়টায় ফিরপোজে, কেমন?'

'দেড়টায়। ফিরপোজে।'

'আজকের মত চলি তাহলে?'

'কোনদিকে যাবেন আপনি?'

'পার্ক সার্কাসের দিকে। কাজ আছে একটা। আপনি?'

'ঘরে ফিরব। চলুন, লোয়ার সারকুলার রোডে নামিয়ে দেব আপনাকে।'

'আপনি···'

'গাড়ি আছে।'

বার কয়েক খক্ খক্ কেশে স্টার্ট নিল এ্যামব্যাসাডার। নিপুণ হাতে ড্রাইভ করছে দীপালি। রানা বলল, 'ছবিটার খোঁজ সত্যি পাব বলে মনে করেন?'

'কোন গ্যালারিতে নেই।' মৃদু হেসে রানার দিকে চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিল দীপালি। 'এটুকু এখুনি বলতে পারি। থাকলে আমার চোখে পড়তই। কেউ হয়তো কিনে নিয়েছে। এক কাজ করুন, ফটোটা আমাকে দিন। কিছু লোককে আপনার ফটোটার পিছনের ছবিটা দেখালে ফল হতে পারে।'

'সত্যি ছবিটার প্রেমে পড়ে গেছি আমি,' রানা বলল। 'মূল ছবিটা যদি না পাই তাহলে এটাই আমার একমাত্র সম্বল। এটাকে হাতছাড়া করতে কষ্ট হবে।'

হেসে ফেলল দীপালি। বলল, 'আপনি যে জিনিসের প্রেমে পড়েন সে জিনিস বুঝি কিছুতেই হাতছাড়া করতে চান না?'

'না চাই না, কে চায় বলুন?'

'রমণীর প্রেমে পড়েননি?'

'অসংখ্যবার।'

'তাদেরকে কি ধরে রাখতে পেরেছেন?'

'না। তাদেরকে "জিনিস" মনে করি না। ধরে রাখার চেষ্টাও করিনি।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ গাড়ি চালিয়ে গতি কমাল দীপালি। 'আপনাকে এখানে নামিয়ে দিই?'

'দিন। এই দেখুন, এইভাবেই একসাথে চলতে চলতে সময় আসে, দূরে সরে যেতে হয়।'

'ঠিক বলেছেন। ভাগ্যিস আপনার প্রেমে পড়িনি!'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তাহলে খুব কষ্ট হত। কিন্তু কেউ কি বলতে পারে কখন কি হয়? ইউ নেভার নো?'

হাসল দীপালি, হাত নেড়ে ছেড়ে দিল গাড়ি।

মাংসের দোকান দুটো আগের মতই বন্ধ দেখল রানা। ফ্ল্যাটবাড়িটার সিঁড়িতে দু'জন প্রৌঢ় লোক ফিসফিস করে কথা বলছিল। রানাকে দেখে একটু যেন চমকাল দু'জনেই। যেন বাচ্চা ছেলের হাত থেকে চকলেট কেড়ে নিয়ে খাচ্ছিল, ধরা পড়ে গেছে হাতেনাতে।

দু'জন দু'দিকে সরে গিয়ে পথ করে দিল রানাকে। সিঁড়ির মাথায় উঠে ঘাড় ফিরিয়ে রানা দেখল নেমে যাচ্ছে ওরা তরতর করে।

সুধীরের কামরায় দরজাটা খোলা দেখল রানা দূর থেকেই। বিচিত্র একটু টুকরো হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে।

সন্দেহ অমূলক নয়। চৌকাঠ পেরিয়েই রানা দেখল ঘরটা ফাঁকা। কেউ নেই। একপাশে একটা চৌকি, দেয়ালের ধার ঘেঁষে একটা টেবিল, সামনে চেয়ার। কাপড়-চোপড়, তোশক-বালিশ, কাগজপত্র, এমন কি একটা আলপিন পর্যন্ত নেই। একেবারে ফাঁকা।

বাথরুম দেখার প্রয়োজন ছিল না। তবু দরজা ঠেলে উঁকি দিল রানা।
পালিয়েছে সুধীর।
রাশেদুজ্জামানকে চিনতে পেরে আততায়ীকে খবর দিয়েছিল এই লোকটাই। ভুল লোক মারা পড়ায় পালিয়েছে ভড়কে গিয়ে।

পাঁচ

আরও কয়েকটা আর্টগ্যালারি ঘুরে প্রিন্সেস রোডের এমব্যাসী হোটেলে লাঞ্চ সেরে হোটেলে ফেরার জন্য ট্যাক্সি নিল রানা।
একটা নয়, দুটো পুলিসের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে হোটেলের সামনে। ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দশ টাকার নোট ধরিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে ভিতরে ঢুকল রানা।
'সম্মানীয় অতিথি!' বুড়ো নৃপেণ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'একজন বিদুষী ভদ্রমহিলা আপনার দর্শন-প্রার্থিনী…'
'ভদ্রমহিলা?'
'বাংলাদেশের ভদ্রা।'
কোলকাতায় রাশেদের খোঁজ করছে বাংলাদেশের মেয়ে? কে এই মহিলা? রাশেদের সাথে পরিচয় ছিল?
'কোথায় তিনি?'
'তা তো জানি না, স্যার।'
'পরিষ্কার করে বলুন।' ধমক দিল রানা।
'ঘণ্টা দুয়েক আগে স্যারের খোঁজে এসেছিলেন, স্যার।'
'পরিচয় দিয়ে গেছেন?'
'না। জিজ্ঞাসাবাদ করতে সাহস পাইনি, স্যার…'
'সাহস পাননি! কেন?'
'আশি প্রকার ব্যামোয়…' বুড়ো কোমরে হাত রাখল।
'মি. রাশেদ!'
দোতলার সিঁড়ির মাথায় ইন্সপেক্টর ভট্টকে দেখল রানা।
'বিরক্ত করব আবার।' ভট্ট গম্ভীর।
কথা না বলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল রানা।
'আরও প্রশ্ন? নাকি খুনীকে ধরেছেন?'
'প্রশ্ন নয়, মি. রাশেদ।' ইন্সপেক্টর ভট্ট রানার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল। 'আমার সাথে আসুন।'
করিডরের শেষ প্রান্তের একটা কামরায় ঢুকল ইন্সপেক্টর ভট্ট রানাকে নিয়ে। একজন মধ্যবয়েসী মহিলা চেয়ারে বসে আছেন। হাল ছেড়ে দেওয়া ভঙ্গি। সাদা পোশাকে দু'জন পুলিসের লোক এক পাশে।
'জিতেন বাবুর স্ত্রী।' মহিলার দিকে আবছা ইঙ্গিত করে বলল ইন্সপেক্টর।

মহিলার দিকে না তাকিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে চাইল রানা ইন্সপেক্টরের দিকে। ব্যাটা সারারাত না ঘুমিয়ে চিন্তাভাবনা করে শেষ পর্যন্ত ওকেই সাব্যস্ত করেছে খুনী হিসেবে। লোকটার পিছন দিকটায় যদি কষে একটা লাথ মারা যেত!

'ইনি মি. রাশেদুজ্জামান। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন।' নরম গলা ইন্সপেক্টরের, কথা বলছে জিতেন বাবুর স্ত্রীর দিকে চেয়ে। 'চেনেন কিনা দেখুন তো ভাল করে। ভাল করে দেখুন।' রিপিট করল কথাটা।

'না।' নিস্পৃহ কণ্ঠে বললেন জিতেন বাবুর স্ত্রী। 'ওঁকে আমি কখনও দেখিনি।'

'ভাল করে দেখুন।' প্রায় ধমকে উঠল ভট্ট। 'স্মরণ করার চেষ্টা করুন। সময় নিয়ে দেখুন আবার।'

রানার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জিতেন বাবুর স্ত্রী বললেন, 'কেন খামোকা ভদ্রলোককে বিরক্ত করছেন? যেতে দিন ওঁকে। ওঁকে আমি চিনি না।'

'যেতে পারি আমি?' ইন্সপেক্টরকে সময় না দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'না।' রানার মুখোমুখি দাঁড়াল ইন্সপেক্টর। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলাম গতকাল। গতরাতে আটটা থেকে সাড়ে দশটা অবধি কোথায় ছিলেন?'

'আটটা থেকে পৌনে ন'টা অবধি রাস্তায় রাস্তায় হেঁটেছি। পৌনে ন'টা থেকে সোয়া ন'টা অবধি ছিলাম ব্রিস্টল হোটেলে। ডিনার সেরে হাওয়া খেতে গিয়েছিলাম গড়ের মাঠে। ওখানে ছিলাম রাত সাড়ে দশটা অবধি।'

'একা?'

'একা।'

'আপনার কথার সত্যতা প্রমাণ করতে পারবেন?'

রানা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'আপনার কি মনে হয়? পারা সম্ভব? আমার জায়গায় আপনি হলে পারতেন?'

দুই কোমরে হাত রাখল ইন্সপেক্টর, 'আপনি কি পুলিসের সাথে সহযোগিতা করতে চান না?'

'সহযোগিতার ব্যাখ্যা চাইতে পারি?'

দু'জন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে আছে।

'আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ইন্সপেক্টর।

'কোন্ প্রশ্নটার উত্তর দিইনি?' রানা হঠাৎ মরিয়া হয়ে উঠল। নিজের দুই কোমরে হাত রাখল এবার ও।

'কোথায় ছিলেন গতরাতে?'

'উত্তর দিয়েছি।'

'প্রমাণ করতে পারবেন?'

'সম্ভব না।'

'জানেন,' আগুন ঝরছে ইন্সপেক্টরের দু'চোখ দিয়ে। 'ইচ্ছা করলে

আপনাকে আমি অ্যারেস্ট করতে পারি?'

'পারেন,' বলল রানা। 'যদি ওয়ারেন্ট থাকে। অ্যারেস্ট করেও বিশ মিনিটের বেশি আটকে রাখতে পারবেন না। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।'

বেশ একটু দমে গেল ইন্সপেক্টর। কিন্তু গলা নামাল না, 'জানতে পারি কতদিন থাকবেন কোলকাতায়?'

'এখনও ঠিক করিনি।'

'এই হোটেল এবং এই শহর আপনি ত্যাগ করতে পারবেন না। পুলিসের অনুমতি ছাড়া। এক হপ্তা আপনার ওপর এই আদেশ বলবৎ থাকবে।'

'এক হপ্তার মধ্যে এই হোটেল ত্যাগ করার কোন প্ল্যান নেই আমার।'

'যেতে পারেন আপনি।'

নিজের কামরায় ফিরে রানা ভাবল, ব্যাপার কি? জিতেন বাবুর খুনী ওকে খুন করতে চেয়েছিল। পারেনি। পারেনি বলে ভট্টকে লেলিয়ে দিয়েছে নাকি ওর বিরুদ্ধে?

একজন মেয়ে এসেছিল ওর খোঁজে। কে হতে পারে?

ক্রিং ক্রিং...

মেয়েটার ফোন? দ্বিতীয়বার রিঙ হতে রিসিভার তুলে নিল রানা, 'রাশেদুজ্জামান খান বলছি।'

'রাশেদ!' একটা মেয়ের গলা, 'চিনতে পারছ আমাকে?'

চেনা চেনা গলা। অতি পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু ঠিক চিনে ওঠা যাচ্ছে না।

'রাশেদ!'

চমকে উঠল রানা। চিনে ফেলেছে ও। 'সেলিনা! তুমি! কোলকাতায়!'

'হ্যাঁ। তোমাকে না দেখে থাকতে পারলাম না। রাগ করলে?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল সেলিনা।

'না।' গম্ভীর গলায় বলল রানা।

'হোটেলের ম্যানেজার আমার কথা বলেনি তোমাকে?'

'পরিচয় রেখে যাওনি কেন?'

'ভয়ে।'

'ভয়ে?'

'তোমার কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু জানি না কিনা, তাই। কেন যেন মনে হলো নিজের পরিচয়টা গোপন রাখাই ভাল। জানো, আমি আমার হোটেল থেকে ফোনও করছি না। হোটেলের বাইরে একটা ড্রাগ স্টোর থেকে কথা বলছি।'

'কোন্ হোটেলে উঠেছ?'

'হোটেল সিসিল। কলেজ স্ট্রীটে। বাবা এখানেই ওঠেন কোলকাতায় এলে।'

'তোমার বাবা জানেন তুমি এখানে এসেছ?'

'জানেন। কোলকাতায় আমাদের ব্যবসা আছে। দেখা শোনার জন্য

বাবা এলে প্রায়ই সাথে আমিও আসি। বাবাকে রাজি করিয়ে এবার একাই চলে এসেছি। রাশেদ?'

'বলো।'

'সত্যি রাগ করেছ?'

'না।'

'কখন দেখা হবে?' ফিস ফিসে সেলিনার কণ্ঠ।

'রাত আটটায়।'

'ডিনার?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল চেনো?'

'চিনি।'

'রেস্তোরাঁয় থেকো। ঠিক আটটার সময়।'

সেলিনা হঠাৎ জানতে চাইল, 'আসবে তো?'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার, 'সন্দেহ কেন?'

'সন্দেহ নয়, ভয়।' রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে সেলিনা বলল, 'তোমাকে আমি এখনও চিনতে পারিনি, রাশেদ।'

ওকে অনুসরণ করে কোলকাতায় চলে এসেছে মেয়েটা—কেন? ওর প্ল্যান-প্রোগ্রাম কি সেলিনার জন্যে বাতিল হয়ে যাবে? কিন্তু কিসের প্ল্যান-প্রোগ্রাম! কোন প্ল্যানই তৈরি করতে পারেনি ও। কাজের রূপরেখা স্পষ্ট হয়নি এখন পর্যন্ত। তবু খসাতে হবে মেয়েটাকে।

সেলিনার শেষের কথাটা মন থেকে তাড়াতে পারল না রানা। কথাটা বলে ঠিক কি বোঝাতে চাইল সে?

রেস্তোরাঁয় ঢুকে বোকা বনে গেল রানা। কোথাও নেই সেলিনা। চট্ করে রিস্টওয়াচটা দেখে নিল একবার। আটটা পাঁচ। সেলিনা পৌঁছোয়নি নাকি এখনও? কেমন যেন অবিশ্বাস্য ঠেকল ব্যাপারটা। যে মেয়ে ঢাকা থেকে ছুটে এসেছে...

একজন ওয়েটার এগিয়ে আসছে ওর দিকে।

'মি. রাশেদ, আজ্ঞে!'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'একজন ভদ্রমহিলা তেরো নম্বর কেবিনে অপেক্ষা করছেন।'

ফাঁদ নয়তো?

কথাটা মনে হতেই মুচকি হাসল রানা। ফাঁদই। প্রেমের ফাঁদ।

রানাকে দেখে হাঁফ ছাড়ল সেলিনা, 'ভয়ে ঘেমে একাকার হয়ে গেছি।'

মুখোমুখি বসে রানা বলল, 'সব কিছুতেই ভয়—রোগ নাকি?'

রানার দিকে চেয়ে রইল সেলিনা। আহত হয়েছে রানার কথায়।

আনন্দোজ্জ্বল মুখটা নিভে গেছে হঠাৎ।

ওয়েটার ঢুকল কেবিনে। বিয়ারের অর্ডার দিল রানা। নিষ্ক্রান্ত হলো ওয়েটার।

'রাশেদ!'

'বলো।' সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা।

'কে তুমি!' ফিস ফিস করে প্রশ্নটা করল সেলিনা।

প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করতে গিয়ে থমকে গেল রানার হাত। এক সেকেন্ড। সেলিনার দিকে তাকাল না সে। সিগারেটটা ঠোঁটে লাগিয়ে একটু সময় নিয়ে আগুন ধরাল। নীল ধোঁয়া সিলিংয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চোখ নামাল সেলিনার চোখে, 'কখন জেনেছ?'

'খেলাঘরে। সেইদিন। কে তুমি?' নরম গলায় জিজ্ঞেস করল সেলিনা। এতটুকু বিচলিত নয় সে।

'তখন জানতে চাওনি কেন?'

রানার মুখের উপর চোখ রেখে কি যেন খুঁজল সেলিনা। ম্লান হাসল। চোখের কোণে পানি চিক চিক করছে, দেখতে পেল রানা।

'তোমাকে হারাবার ভয়ে।'

'আমি রাশেদ নই তা জানার পরও?'

প্রায় অস্পষ্ট শোনাল সেলিনার কথাগুলো, 'তুমি রাশেদ নও বলেই।'

'অদ্ভুত শোনাচ্ছে।'

'হয়তো,' বলল সেলিনা। 'কিন্তু মিথ্যে নয়। রাশেদকে আমি ভালবাসতাম। কি রকম ভালবাসা জানো? ওর সাথে আমার সম্পর্কটা গড়ে ওঠে জেদের মাথায়। আমার সাথে ওর বিয়ের কথা ছোটবেলা থেকে। যখন আমরা একসাথে স্কুলে যেতাম। তখন থেকেই স্বামীত্বের দাবি নিয়ে আমার ওপর অত্যাচার করত রাশেদ। চাকর খাটাত, মারধর করত। আশ্চর্য লাগে এখন এই ভেবে, ওর আঘাতে অসহায়ের মত কেঁদেছি লুকিয়ে লুকিয়ে, খোদাকে ডেকে বলেছি ওর সুমতি দাও, কিন্তু কোনদিন প্রতিবাদ করিনি, কারও কাছে অভিযোগ জানাইনি।'

ওয়েটার বোতল আর গ্লাস নিয়ে ভেতরে ঢুকল। আলতো করে ঢালল একগ্লাস।

সেলিনা বলল, 'জানালার পর্দাটা সরিয়ে দাও তো?'

পর্দা সরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ওয়েটার।

'অত্যাচার সহ্য করার জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলাম আমি,' আবার বলতে শুরু করল সেলিনা। 'জানতাম, ওর সাথেই আমার বিয়ে হবে। প্রতিবাদ করা বৃথা। যার যা কপাল। এরপর বড় হলাম আমরা। আমি হলাম ওর খেলার পুতুল। ঠিক এর পরই গণ্ডগোলটা লাগল। খেলাঘরে ধরা পড়ে গেলাম একদিন বাবার হাতে। সে কী লজ্জা! কান ধরে বের করে দিলেন তিনি রাশেদকে। ওর বাবাকে ডেকে জানিয়ে দিলেন, বিয়ে হবে না।'

'তারপর?'

'বাবার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলাম না। গভীর রাতে গোপনে মিলিত হতে শুরু করলাম খেলাঘরে। বাবার নজর এড়িয়ে। বাবা হঠাৎ অমন একটা সিদ্ধান্ত না নিলে কিছুদিন পর হয়তো রাশেদের অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত হবার জন্যে নিজেই চেষ্টা করতাম। কিন্তু বাবার সিদ্ধান্তকে অবহেলা করার জন্যে রাশেদকেই বিয়ে করব, করুক অত্যাচার, এই রকম একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলেছিলাম তখন।'

গ্লাসে চুমুক দিল রানা।

'রাশেদের মৃত্যুর খবর পেয়ে কোন প্রতিক্রিয়াই হয়নি আমার মধ্যে। নিজের নির্লিপ্ত ভাব দেখে নিজেই অবাক হয়েছিলাম। রাশেদের প্রভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল এমনিতেই। দূরে সরে যাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল একেবারে। বাবা বিয়ের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আপত্তি করিনি আমি। বিয়ে হলো। লোকটা দ্বিতীয় রাশেদ। হঠাৎ মারা গেল লোকটা। লোকটা মারা যেতে যে খুব একটা শান্তি পেলাম তা নয়। বড় একা লাগত। ভাবতাম যত অত্যাচারই করুক, রাশেদ বেঁচে থাকলে ভাল হত।'

চুপ করল সেলিনা। রানা কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আবার শুরু করল সেলিনা, 'তোমাকে দেখে রাশেদ মনে করেছিলাম—খুশিও হয়েছিলাম। খুশি হয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু মন নেচে ওঠা যাকে বলে তা হয়নি। নাচল পরে। যখন জানলাম—তুমি রাশেদ নও।'

অসহায় ভাবে হাসল সেলিনা, 'মাথা ব্যথা করছে, না?'

'না।' বলল রানা, 'তোমার কথাগুলো মনের কোন্‌খানটায় যেন স্পর্শ করছে।'

'রাশেদ—নামটা জানাবে না?'

হাসল রানা।

'ঠিক আছে। জানতে চাইব না। কি ভাবছ?'

'ভাবছি, বড় ভয়ঙ্কর আমার জীবন। তোমার সাথে এভাবে পরিচয় না হলেই ভাল হত সেলিনা। মনে হচ্ছে, অন্যায় করেছি। সেদিন তোমাকে সব খুলে বললে হয়তো অঘটনটা ঘটত না।'

'ঘটত।' রহস্যময়ী রাত্রির মত হাসল সেলিনা।

সোজা সেলিনার চোখে চোখ রাখল রানা। দেখতে দেখতে গলে তরল হয়ে গেল সেলিনার টানা চোখের দৃষ্টি। টেবিলের উপর রানার হাতে রাখল একটা হাত।

'কিছুই চাইব না—শুধু মাঝে মাঝে দেখতে চাই, রাশেদ। কথা দিচ্ছি, তোমার কাজে বাধা সৃষ্টি করব না কোনদিন। কোনদিন কোন দাবি নিয়ে পথ আগলাব না।'

কেন জানি বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল রানার। চট করে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। 'খাবে না?'

'খুব খিদে পেয়েছে।'

দেয়ালের বোতামটা টিপল রানা।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সেলিনা, 'কে! রাশেদ··· কে!'

সেলিনার দৃষ্টি রানার পেছনে। বিয়ারের ভারী গ্লাসটা হাতে ছিল রানার। বিদ্যুৎবেগে মাথাটা একপাশে সরিয়ে নিয়ে সাঁই করে পেছন দিকে ছুঁড়ে মারল গ্লাসটা। প্রায় একই সাথে ওয়ালথারটা বেরিয়ে এসেছে ওর হাতে। ঝট্ করে ফিরল পেছনে।

কেউ নেই জানালার সামনে।

'একটা বিকট চেহারার লোক! সরে গেল! উঁকি দিয়ে দেখছিল···'

ওয়েটারের পায়ের শব্দ শুনে পিস্তলটা লুকিয়ে ফেলল রানা হোলস্টারে।

'স্যার!'

রানা ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'জানালার ওপাশে একজন লোক ছিল।'

'দেখার চেষ্টা করছিল আমাদেরকে!' সেলিনার গলা কাঁপছে।

'এক্ষুণি দেখছি, স্যার।' ব্যস্ত হয়ে উঠল ওয়েটার।

'থাক,' বারণ করল রানা। 'পাওয়া যাবে না। কি আছে পেছনে?'

'একটা বড় নর্দমা। মেথরেরা যাওয়া আসা করে।'

আর কথা না বাড়িয়ে ডিনারের অর্ডার দিল রানা। ছোট স্লিপ প্যাডে লিখে নিয়ে চলে গেল ওয়েটার।

'কে বলো তো?'

জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে সেলিনার পাশের সীটে গিয়ে বসল রানা। 'হারামী কোন লোক হবে। সাহেব বিবি কেবিনের ভেতর চুমুটুমু খাচ্ছে কিনা দেখছিল হয়তো।'

'না!' বলে উঠল সেলিনা, 'মিথ্যে সান্ত্বনা দিচ্ছ আমাকে। লোকটা তোমার ক্ষতি করার জন্যে অমন করে দেখছিল। তুমি তা জানো। তা না হলে পিস্তল বের করলে কেন?'

হাসল রানা।

'রাশেদ!'

'বলো।'

'তোমার কাজটা খুব রিস্কি। তাই না?'

'হ্যাঁ,' রানা বলল, 'রোমাঞ্চকরও।'

'কিছু একটা ঘটে গেলে?'

'প্রাণপণে ঠেকাবার চেষ্টা করব। তবু যদি ঘটে—ঘটবে।'

'না!' প্রবল আপত্তি জানাল সেলিনা।

'কি না?'

'মরতে পারবে না তুমি।'

হাসল রানা। এ-ও দেখছি বুড়ো-খোকা মেজর জেনারেল রাহাত খানের

মত। মরতে পারবে না তুমি··· অফিশিয়াল অর্ডার! আশ্চর্য দাবি!

'আদেশ শিরোধার্য। মরব না আমি।'

হেসে ফেলল সেলিনা।

ন'টার মধ্যে খাওয়াদাওয়া সেরে হাঁটতে হাঁটতে ইডেন গার্ডেনে চলে এল ওরা। জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কপোত-কপোতী। কোথাও কোলাহল নেই। চাঁদের আলোয় ইডেন গার্ডেনকে অপূর্ব লাগছে। হাত ধরাধরি করে হাঁটছে ওরা। নদীর ধারে চলে এসেছে।

অনর্গল কথা বলছে সেলিনা। মার কথা, ছোটবেলার কথা। পছন্দ-অপছন্দের কথা। রানা শুনছে। হাঁটছে।

চারদিকে তাকিয়ে দেখল রানা কেউ নেই। বুকের কাছে টানল সেলিনাকে।

এঁকেবেঁকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল সেলিনা। 'এখানে না। প্লীজ! কেউ দেখে ফেলবে।'

কয়েক পা হাঁটল ওরা আবার হাত ধরাধরি করে। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সেলিনা, 'রাশেদ!'

কালো বিড়ালটাকে রানাও দেখতে পেয়েছে। ছুটে আসছে ওদের দিকে।

দুই হাতে জড়িয়ে ধরেছে সেলিনা রানাকে। খুব ভয় পেয়েছে ও।

'তাড়াও! রাশেদ!'

হাসতে শুরু করল রানা। পঁচিশ হাত দূরে একটা লম্বা নিওন বাতি জ্বলছে। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বিড়ালটাকে। থমকে দাঁড়িয়েছে সেলিনাকে চেঁচিয়ে উঠতে দেখে। ভয় পেয়েছে সে-ও।

'বিড়াল দেখলে মরে যাবার মত দশা হয় আমার!' চোখ বুজে কথা বলছে সেলিনা। 'প্লীজ, রাশেদ তাড়িয়ে দাও ওটাকে···'

'ছাড়ো তাহলে আমাকে।'

সেলিনা ছেড়ে দিতেই হাত উঁচু করে ইট ছোঁড়ার ভঙ্গিতে দ্রুত কয়েক পা এগিয়ে গেল রানা বিড়ালটার দিকে।

ঠিক তখনই দ্বিতীয় আক্রমণ চালাল আততায়ী।

ছয়

ডাইভ দিল রানা। ঘাসের উপর দেহটা আছড়ে পড়ার আগেই আবার গুলি হলো। বগলের নিচে কোটের হাতায় টান পড়ল।

'শুয়ে পড়ো, বোকা মেয়ে!' রানার হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার পি.পি.কে। ঘাড় ফিরিয়ে চাইল রানা বাঁ দিকে। দেখা যাচ্ছে না কাউকে। কোন গাছের আড়ালে লুকিয়ে আছে আততায়ী।

দূরে কে যেন উত্তেজিত গলায় কার নাম ধরে ডাকছে। কাছাকাছি কোন শব্দ নেই। বাঁ পাশের গাছপালার দিকে চোখ রেখে অপেক্ষা করছে রানা। আবার গুলি ছুঁড়বে, জানে রানা। চাইছেও তাই। অবস্থানটা জানা দরকার।

বোকা বনে গেল ডানদিক থেকে পিস্তলের শব্দ হতে। আগুনের হল্কা দেখেই বিদ্যুৎবেগে ঘুরল রানার পিস্তল ধরা হাত। মৃদু চাপ দিল ট্রিগারে।

চাপা কাতরানির শব্দ ভেসে এল।

বাঁ দিকে তাকাল রানা আবার। ঘাসের উপর মৃদু শব্দ শুনে চট করে চেয়ে দেখল বুকে হেঁটে এগিয়ে আসছে সেলিনা। ঘাড় ফিরিয়ে নেবার আগেই আবার গুলি হলো। তীরের মত এসে বিধল মুখে, কপালে মাটির টুকরো। শব্দ লক্ষ্য করে ট্রিগারে চাপ দিল রানা পর পর দু'বার। পাঁচ সেকেন্ডের বিরতি। আবার ট্রিগার টিপল রানা। কাঁচ ভাঙ্গার শব্দ হলো।

অব্যর্থ লক্ষ্য। অন্ধকার হয়ে গেল চারদিক। নিওন বাতিটা ভেঙ্গে দিয়েছে রানার বুলেট।

তড়াক করে উঠে দাঁড়াল রানা। হ্যাঁচকা টানে তুলল সেলিনাকে। হাঁপাচ্ছে সেলিনা। দ্রুতপায়ে সরে যাচ্ছে ওরা নিঃশব্দে।

কোথাও কোন জটলা দেখল না ওরা। গুলির শব্দে বেশির ভাগ লোকই জেগেছে। বাকিরা গা ঢাকা দিয়ে চেষ্টা করছে প্রাণ বাঁচাবার।

বাইরে বেরিয়ে এসে রিকশা, ট্যাক্সি কিছুই পেল না ওরা। হাঁটতে লাগল ফুটপাথ ধরে। মিনিট তিনেক পর সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। দুটো হেডলাইটকে সবেগে ছুটে আসতে দেখে সেলিনা বলল, 'পুলিস আসছে খবর পেয়ে।'

ম্যেয়ো ও ডাফরিন রোডের চৌমাথায় এসে ট্যাক্সি পাওয়া গেল। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারের উদ্দেশে বলল রানা, 'হোটেল সিসিল।'

মিনিট তিনেক চুপচাপ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থেকে সেলিনা ডাকল, 'রাশেদ!'

সেলিনার হাতে চাপ দিল রানা।

'একটা কথা তোমাকে এতক্ষণ বলিনি। ভেবেছিলাম হোটেলে গিয়ে ওটা দেখিয়ে তোমাকে চমকে দেব।'

'কি জিনিস?'

'সেই পুতুলটা।'

'পুতুল?' পরমুহূর্তে মনে পড়ল রানার, 'যেটা উপহার পাঠিয়েছিল রাশেদ তোমাকে?'

'হ্যাঁ...'

'সেটা তুমি সাথে করে নিয়ে এসেছ?' রানা অবাক।

'হ্যাঁ। কারণ আছে। মনে নেই, খেলাঘরের এককোণে ছুঁড়ে ফেলেছিলাম ওটাকে? তুমি চলে আসার পর ওটা তুলে রাখতে গিয়ে দেখি মুণ্ডুটা খসে গেছে। ওটা আবার জায়গা মত বসাতে গিয়ে পুতুলের ভেতর কি পেয়েছি

জানো?'

দ্রুতবেগে চিন্তা চলছে রানার মাথার মধ্যে। বলল 'নক্সা।'

অবাক হয়ে চাইল সেলিনা রানার মুখের দিকে। 'তুমি জানলে কি করে? তুমি তো রাশেদ নও। তুমি কি করে জানলে কি আছে পুতুলের ভেতর?'

'সে অনেক কথা, সেলিনা। পরে বলব। এখন তোমার কথা শোনা যাক। ম্যাপটা পেয়ে কি ভাবলে?'

'ম্যাপটা অবশ্য পুরো নেই, অর্ধেক। তবু ভাবলাম, তোমার কাজে লাগতে পারে।' হাসল। 'ছুতো পেয়ে গেলাম তোমার কাছে আসার।'

'কোথায় রেখেছ ওটা?'

'হোটেলে। আমার কামরায়।'

গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রানা। আনমনে সিগারেট ধরাল একটা। দেখা যাচ্ছে, অর্ধেক ম্যাপ পাঠিয়েছিল রাশেদ সেলিনার কাছে। কোন্ অর্ধেক এটা? বাকি অর্ধেকটা কোথায়? কার কাছে? বাকি অর্ধেক যার কাছেই থাক, সেটার সাহায্যে বঙ্গোপসাগরের আড়াই টন সোনা উদ্ধার করা সম্ভব নয় কারও পক্ষে। কিন্তু তাহলে ডুব দেয়ার জন্যে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে কিভাবে? সাজ্জাদের রিপোর্ট যদি সত্যি হয় তাহলে অন্তত দুটো দল প্রস্তুত হচ্ছে সোনা উদ্ধারের জন্যে। এই কোলকাতাতেই।

ম্যাপের একটা অংশ এতদিন ধরে পড়ে আছে সেলিনার কাছে, কেউ জানত না কোথায় আছে সেটা, তাহলে ম্যাপ বেচাকেনা বা সোনা উদ্ধারের প্রস্তুতি, এসব চলছে কিসের জোরে? কিছু একটা মস্ত গোলমাল রয়েছে কোথাও। কোথায়?

জট লেগে গেছে রানার মনে—কিছুতেই পরিষ্কার হচ্ছে না কিছু। বুঝতে পারল, আরও রহস্যের উন্মোচন দরকার।

পিপলস্ গ্যালারি।

সকালবেলার ব্যস্ততা চারদিকে। কাজে যাচ্ছে মানুষ। ট্রামে, বাসে চড়া তো অসম্ভব ব্যাপার—তাকাতেও ভয় করে। চাকে ঢিল খাওয়া মৌমাছির মত ছেঁকে ধরেছে ওগুলোকে অসংখ্য মানুষ। গিজগিজ করছে অগণিত কালো মাথা। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গুঁতোগুঁতি করছে কার আগে কে উঠবে। ফুটপাথেও তিল ধারণের ঠাঁই নেই। থেমেছ কি খাও ধাক্কা।

ট্যাক্সি থেকে নেমে তখুনি ভিতরে ঢুকল না রানা। বাইরে থেকে দেখে নিচ্ছে চারটা পাশ।

গঙ্গার ধারে প্রকাণ্ড মান্ধাতা আমলের দালান। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তৈরি করেছিল তখন কোন বড়লোক রাজা বাহাদুর বা জমিদার।

আর্ট গ্যালারির গেটে গার্ড থাকে জানা ছিল না রানার। সুধীর গত পরশুদিন রাতে যখন এই গেটের ভিতর ঢুকতে গিয়েও ঢোকেনি তখন গার্ড ছিল না। পরিষ্কার মনে আছে রানার।

লোকটাকে ভাল লাগল না ওর। চেহারাটা বিকট। বাঙালী নয়, মাদ্রাজী। ন্যাড়া মাথা, হাফপ্যান্ট, ভুরু চাঁছা। চোখেমুখে একটা বেপরোয়া, রগচটা ভঙ্গি। চেয়ে আছে রানার দিকে চোখ কুঁচকে। রানার উপস্থিতি অপছন্দ করছে।

চোখাচোখি হবার পর থেকেই দৃষ্টি সরাল না রানা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল ও। চোখ না সরিয়েই। তারপর পা বাড়াল।

রানা যে ঠিক ভেতো বাঙালীদের দলে পড়ে না তা ওর চোখের দিকে চেয়েই টের পেয়েছে হাফপ্যান্ট। চেয়ে রইল, কিন্তু বাধা দেবার বা কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস পেল না।

গেটের পর প্রশস্ত একটা মাঠ। তারপর গাছপালার ঘন জঙ্গল। এককালে ফলমূল হত, এখন বুড়ো হয়ে গেছে। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে চওড়া রাস্তা। দালানটা ঘোড়ার খুরের মত, দুই প্রান্ত প্রায় নদীতে গিয়ে মিশেছে। সামনে দাঁড়ালে কোন প্রান্তই চোখে পড়ে না। দোতলা।

নিচে গ্যালারি। দোতলায় ক্লাস বসে। বারো বছরের কম বয়েসী ছেলে-মেয়েরা এখানে ছবি আঁকা শিখতে আসে। নোটিশ বোর্ডে আরও নানারকম তথ্য পেল রানা। গ্যালারিতে ঢোকার আগে নাম ঠিকানা লিখে দিতে হবে।

অফিসরুম দিয়েই গ্যালারিতে ঢোকার রাস্তা। দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে থামতে হলো।

অফিসরুমের ভিতর আর এক পালোয়ান। হাফপ্যান্ট নয়, পরনে ল্যাঙোট। গ্যালারির পরিবেশটা বিচিত্র ঠেকল রানার কাছে। নিষ্পাপ শিশুদের নিয়ে কারবার—এখানে পালোয়ানের প্রয়োজন পড়ল কেন ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ল্যাঙোট পরা লোকটা বাঙালী। বেঢপ ফিগার। পা দুটো অপরিপুষ্ট, কিন্তু দেহের উপরের অংশ গরিলার মত প্রকাণ্ড করে ফেলেছে তুমুল ব্যায়ামের ঠেলায়। খালি গা। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। ক্ষণে ক্ষণে ফুলে উঠা বুকের দিকে তাকাচ্ছে। মুখে আত্মপ্রশংসার মুচকি হাসি। গা জ্বলে যায় দেখলে।

'ব্যায়াম করা খুব ভাল অভ্যেস।' বলল রানা। 'কিন্তু শুধু উপরটা কেন, পায়ের জন্যেও কিছু করা উচিত। তা থামলে কেন? চালিয়ে যাও।'

'মেলাই ফটর ফটর করবেন না, মশাই।' লোকটা চোখ বুজে ওঠ-বোস করল বার পাঁচেক। 'দশটার আগে খোলে না গ্যালারি। কি চান?' ওঠ-বোস শুরু করল আবার।

'সুধীর বাবুর খোঁজে এসেছি।'

'সে তো ভেগেছে···কোন্ সুধীর বাবু?' হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে গেল লোকটা।

'খাসমহল হোটেলের ক্লার্ক। ভেগেছে মানে?'

'ক্লার্ক? না, কোন হোটেলের ক্লার্ক সুধীর-টুধীরকে আমি চিনি না।'

'এই যে বললে ভেগেছে?' রানা প্রশ্ন করল।

'সে অন্য সুধীর।'

'অন্য নয়। আমি যাকে খুঁজছি এ সেই। কোথায় পাব তাকে?'

'মেলাই ঝামেলা করবেন না, মশায়! কি দরকার আপনার সুধীরের সাথে শুনি?'

'আমাকে এখানে আসতে বলেছিলেন।'

'কেন?'

'একটা অয়েলপেন্টিং খুঁজছি আমি। উনি আমাকে বলেছিলেন পিপলস্ গ্যালারিতে জানাশোনা লোক আছে, মাঝে মাঝে সেখানে আমি যাই, আপনি ওখানে আমার সাথে দেখা করতে পারেন। তাই এসেছি।'

'যান, ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করে দেখুনগে। আমি কোন ক্লার্ক-ফ্লার্ককে চিনি না।' আবার বৈঠক শুরু করল পালোয়ান। সেই সাথে কথা বলছে। 'আমি যে সুধীরকে চিনি সে ঠোঙা তৈরি করে মুদী দোকানে বেচে। দোকানদারদের কাছ থেকে অ্যাডভান্স পয়সা নিয়ে ভেগেছে। তিন নম্বর রুম থেকে বেরিয়ে করিডর। সোজা হেঁটে গেলেই দেখতে পাবেন ম্যানেজার লেখা আছে।' চোখ বুজে ওঠ-বোস শুরু করল ল্যাঙোট, 'এক, দুই...'

গ্যালারির প্রথম কামরায় ঢুকে কাউকে দেখল না রানা। চার পাশের দেয়ালে ঝুলানো শিল্পকর্মগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় কামরায় ঢুকল সে।

এ ঘরেও কেউ নেই। বাঁ দিকের দেয়ালে দৃষ্টি পড়তেই থমকে দাঁড়াল রানা। হার্টবিট অপেক্ষাকৃত দ্রুত হলো, টের পেল ও। ছোট্ট একটা ছবির ফ্রেম। বড় বেমানান লাগছে। ছবিটার দু'পাশে বড় বড় দুটো ছবির ফ্রেম রয়েছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেয়ালটা লক্ষ করল রানা। ছোট ছবির দু'পাশে যে বড় ফ্রেম দুটো রয়েছে তার মধ্যে একটির, যেটা বাঁ দিকে ঝুলছে, নিচের একটা কোনা একটু ভাঙা। এই ভাঙাটুকু পরিচিত ঠেকল ওর চোখে।

পরিচিত ঠেকল আরও একটা অদ্ভুত জিনিস। বেমানান ফ্রেমটার কাঁচে একটা জানালার প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে। আশ্চর্য! হুবহু এমনি একটা জানালার প্রতিচ্ছবি রয়েছে ওর বুক পকেটে রাশেদের ফটোগ্রাফে। তবে কি...কিন্তু আসল ছবিটা সরিয়ে এই জায়গায় ঝটপট বেমানান ছবি টাঙানো হলো কেন? ও যে ওই ছবিটা খুঁজছে সেকথা জানাজানি হয়ে গেছে তাহলে?

'এই যে মশায়, ম্যানেজারের কাছে যাননি যে বড়?' রানার পাশে এসে দাঁড়াল ল্যাঙোট। সাথে আরও একজন। হাফপ্যান্ট নয়, এর পরনে ট্রাউজার। আর্মির মত ছোট ছোট চুল মাথায়। দাড়ি-গোঁফ কামানো। একটু বেঁটে কিন্তু বোঝা যায় গায়ে অসুরের শক্তি। পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছে বীরের মত।

'এই ছোট ছবিটা এখানে কেন?' রানা জানতে চাইল। 'মানাচ্ছে না। এত ছোট ফ্রেম এ কামরায় আর একটাও নেই দেখছি। অন্য একটা ছবি ছিল এখানে, তাই না?'

'আবার বকবক করে?' ল্যাঙোট চাইল ট্রাউজারের দিকে। তারপর চোখ পাকিয়ে দেখল রানাকে আপাদমস্তক। 'আমার কথাটা কানে যাচ্ছে না?'

'যাচ্ছে।' কটমট করে চাইল রানা লোকটার চোখে। 'কিন্তু আর একটা কথা বললে তোমার কানে আর কারও কোন কথা ঢুকবে না। চড়িয়ে কান

ফাটিয়ে দেব, অসভ্য কোথাকার!'

'কি বললেন?' এক পা এগিয়ে এল ট্রাউজার। 'নাম-ঠিকানা না লিখে ভেতরে ঢুকেছেন কেন? জানেন, এজন্যে ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারি আমরা আপনাকে এখান থেকে?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারো।' আহ্বান করল রানা। 'কই, এসো?'

ল্যাঙোট বা ট্রাউজার দু'জনের কেউই এগোল না। কারণটা অবশ্য ভীতি বা দুর্বলতা নয়। ল্যাঙোটের দৃষ্টি অনুসরণ করে পিছন ফিরল রানা। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক তন্বী তরুণী। ভ্রূ কুঁচকে রানার চেহারাটা জরিপ করে নিয়ে ল্যাঙোট আর ট্রাউজারকে বলল, 'কি হচ্ছে এখানে? গোলমাল কিসের?' রানাকে আর একনজর দেখে নিয়ে বলল, 'মুখার্জী বাবু ডেকে পাঠিয়েছেন। একে পৌঁছে দাও ম্যানেজারের ঘরে।'

মুহূর্তে ভাব পরিবর্তন করল ট্রাউজার। বলল, 'বেঁচে গেলেন, মশায়। চলুন, আগে বাড়ুন।'

করিডর পেরিয়ে 'ম্যানেজার' লেখা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। নক করার আগেই ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটা। দাঁড়িয়ে আছে স্যুট পরা এক মাঝবয়সী লোক, খুব সম্ভব ম্যানেজার। মুখটা ভাবলেশহীন। রানাকে দেখে এতটুকু প্রতিক্রিয়া হলো না চেহারার কোথাও।

'কাকে চান?' ভারী, গম্ভীর কণ্ঠ।

'আপনিই এই গ্যালারির ম্যানেজার?'

'হ্যাঁ। শশীভূষণ মুখার্জী।'

শশীভূষণ মুখার্জী ঘরে দরজা বন্ধ করে ব্যায়াম করছিল কিনা বলা মুশকিল। তবে এ লোক নিয়মিত ব্যায়াম করে তা বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। প্রায় চল্লিশের মত বয়স। মজবুত কাঠামো। সুঠাম, ঋজু।

খোলা দরজা পথে ঘরের ভিতর তাকিয়ে দেখল রানা। দেয়ালের গায়ে একটা ছবির ফ্রেম দাঁড় করানো রয়েছে। গ্যালারির দ্বিতীয় কামরার অন্যান্য ফ্রেমের মতই বড়। ছবিটা দেখা যাচ্ছে না, উল্টো করে রাখা। মনে হচ্ছে সদ্য খুলে রাখা হয়েছে ওটা।

'দেখুন, এই লোকটা...' রানার বিরুদ্ধে নালিশ করতে যাচ্ছিল ল্যাঙোট।

'এখান থেকে যাও তোমরা।' শান্ত কণ্ঠে হুকুম করল শশীভূষণ। রানার দিকে চাইল, 'বসুন?' কথা বলার ভঙ্গিটা অস্বাভাবিক নির্বিকার।

'আমি একটা ছবি খুঁজছি। সুধীর বাবু বলে এক ভদ্রলোক...'

'চিনি না তাকে।'

'আপনাদের গ্যালারির দ্বিতীয় কামরায় ছিল ছবিটা। ওটা কি দু'এক দিনের মধ্যে বিক্রি হয়েছে? ওই যেখানে একটা বেমানান ছোট ছবি...'

'গত দু'হপ্তার মধ্যে কোন ছবি বিক্রি করিনি আমরা। দুঃখিত।' ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে শশীভূষণ।

'তাহলে কি কোন কারণে সরানো হয়েছে ওটা ওখান থেকে?'

'না।' অন্যদিকে চেয়ে শান্ত গলায় বলল শশীভূষণ।

'ওই যে দেয়ালে দাঁড় করানো ফ্রেম দেখতে পাচ্ছি···ছবিটা দেখতে পারি?'

'না।' ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। 'গ্যালারিতে প্রচুর ছবি আছে। বিনা অনুমতিতে দেখতে পারেন।' ডেস্কের কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা আবার। 'কেন দেখতে চাইছেন?' রানার চোখের উপর রাখল চোখ।

'কৌতূহল।'

লম্বা পা ফেলে ফ্রেমটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল শশীভূষণ। ধীরে ধীরে ম্যাজিক দেখানোর ভঙ্গিতে রানার দিকে ফিরাল ফ্রেমটা। ফাঁকা। কোন ছবি নেই ওতে।

'কৌতূহল নিবৃত্ত হয়েছে?'

বাঁকা একটুকরো হাসি লটকে রয়েছে লোকটার ঠোঁটে। এগিয়ে এল দরজার কাছে। দরজার দুই কপাটে দু'হাত রেখে বলল, 'এবার আসুন।'

ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সাত

কাঁটায় কাঁটায় দেড়টার সময় পৌঁছল রানা ফিরপোজ রেস্তোরাঁয়। দীপালি আসেনি এখনও। কোণের একটা টেবিল দখল করে সিগারেট ধরাল একটা।

এই আসে এই আসে করতে করতে পৌনে দু'টা বাজল। একটা বড়পেগ হুইস্কির অর্ডার দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল রানা। আসবে না নাকি মেয়েটা? ব্যাপার কি?

আরও পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে নিজের জন্যে লাঞ্চের অর্ডার দিতে যাচ্ছিল রানা, এমনি সময় চারদিক ঝলসে দিয়ে রেস্তোরাঁয় ঢুকল দীপালি। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে থেমে গেল রেস্তোরাঁর স্বাভাবিক গুঞ্জন। ডানা কাটা পরীর মত লাগছে দীপালিকে লাল শিফনে। খুব খুশি খুশি মুখ। উড়ে আসছে যেন।

'এত খুশি কেন?' রানা জিজ্ঞেস করল, 'আধঘণ্টা লেট আপনি। লেট ফাইন দিতে হবে।'

দীপালির হাসি আরও বিস্তৃত হলো। মুখোমুখি চেয়ারে বসল, 'ফাইন মাফের অ্যাপ্লিকেশন এনেছি। জানেন কি অসাধ্য সাধন করেছি? কল্পনাও করতে পারবেন না···'

'তাই নাকি?' রানা কৌতূহলী।

'আজ্ঞে!' মাথাটা ডানদিকে কাত করল দীপালি। 'দারুণ খবর। কিন্তু আগে বলুন খবরটা শুনে খুশি হলে কি দেবেন আমাকে?'

'কি চান?'

'যা চাইব তা দেবেন?'

'দিতেও পারি। আগে খবরটা শুনি।'

মিটিমিটি হাসছে দীপালি। 'বলুন তো খবরটা কি হতে পারে?'

'ছবিটা খোঁজ করবার জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন ছবিটা বিক্রি হয়ে গেছে। সম্ভবত যে কিনেছে তার নাম-ঠিকানা আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে—এই তো?'

'না!' রানা বলতে পারেনি দেখে আনন্দে ছটফট করে উঠল দীপালি, 'খবরটা ছবি সম্পর্কেই। ছবিটা এখন কোথায় জানেন?'

'কোথায়? কোন বিদেশী দূতাবাস-প্রধান কিনে তার দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছে?'

'না। ওটা এখন আমার শোবার ঘরে।'

এতটা আশা করেনি রানা। 'সত্যি!'

'তবে কি মিথ্যে বলছি! কাল থেকে ছবিটার খোঁজে কম করে একশো জনের কাছে ফোন করেছি। আজ সাড়ে এগারোটার সময় একজন রিঙ করে জানাল যে তার এক পিসতুতো ভাই ওরকম একটা ছবি কিনেছিল বছর দেড়েক আগে। পিসতুতো ভাইটি থাকে লুধিয়ানা, পাঞ্জাবে। ফ্যামিলি থাকে কোলকাতাতেই।'

'তারপর?'

'দেখতে গেলাম ছবিটা। দেখেই বুঝলাম এই ছবিই আপনি খুঁজছেন। দর কষাকষির সুযোগই দিলাম না, একশো টাকায় ছবিটা কিনেছিল ভদ্রলোক, তার স্ত্রীর হাতে দুশো টাকা গুঁজে দিয়ে কাগজে মুড়ে নিয়ে চলে এলাম। দামটা কি বেশি পড়ল?'

'বলেন কি!' রানা বলল, 'দু'হাজার হলেও কিনতাম ওটা আমি। আচ্ছা, ভদ্রলোক কোথা থেকে কিনেছিলেন ওটা জিজ্ঞেস করেননি?'

'করেছিলাম,' বলল দীপালি, 'বলতে পারেনি। ভদ্রলোকের সাথে তখন বিয়েই হয়নি মহিলার।'

চিন্তিত দেখাল রানাকে।

'কি হলো? খুশির খবর শুনে অমন মনমরা হয়ে গেলেন যে?' অবাক হলো দীপালি।

রানা ভাবছিল, এই মেয়েটার সাহায্য নিতে পারলে ভাল হত। কাজের মেয়ে। কিন্তু ওকে ওর কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে কতটুকু বলা যায়? ঝুঁকিই বা কতটুকু? ঝুঁকি নেয়াই স্থির করল সে।

পকেট থেকে সেলিনার দেয়া পুতুলটা বের করল রানা। 'ঠিক এই ধরনের আর একটা পুতুল কিনতে চাই। কোথায় খোঁজ করা যায় বলুন তো?'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল দীপালির চোখ। কয়েক সেকেন্ড অবাক চোখে পুতুলটার দিকে চেয়ে থেকে মাথা নাড়ল। 'বলতে পারছি না। কেন?'

'ঠিক আছে, ওটা খুব জরুরী কিছু নয়,' বলল রানা। পুতুলটা পকেটে পুরল আবার।

'কিছুই বুঝতে পারছি না কিন্তু!' বলল দীপালি। 'ছবিটার সাথে এ

পুতুলের কি সম্পর্ক?'

'ছবিটা কোত্থেকে কিনেছিলেন ভদ্রলোক তা আমার জানা দরকার।' প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে দীপালির চোখের উপর চোখ রেখে বলল রানা। 'খুব দরকার।'

'কেন?' রানার কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারেনি ও।

'পরে বলব। কিন্তু সত্যি, ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।' রানা হাসল। 'পরে এ বিষয়ে আলাপ করা যাবে। অর্ডার দিই লাঞ্চের?'

'দেবেন না মানে।' দীপালি বলল, 'দৌড়াদৌড়ি করে ক্ষিধেয় নাড়িভুঁড়ি জ্বলে যাচ্ছে আমার।' এদিক ওদিক চাইল। 'আপনি অর্ডার দিন, আমি একটা ফোন সেরে আসছি।'

নাইন বাই সেভেন থিয়েটার রোডের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের তেতলার একটা অংশ দীপালির দখলে।

দুটো রুম। ড্রইংরুমে সোফায় বসে ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে একপাশে সরিয়ে রাখল রানা, 'হ্যাঁ এই ছবিটাই।'

'কি দেবেন বলুন এবার!' সাথে সাথে জানতে চাইল দীপালি। 'বাব্বা! রীতিমত গোয়েন্দাগিরি করতে হয়েছে এ ছবি খুঁজে বের করতে।'

'কি নেবেন আপনি?'

'কি নেব…' খানিকক্ষণ চিন্তা করল দীপালি সকৌতুকে। 'দূরছাই? কি চাইব ভেবে পাচ্ছি না—যাক, পরে ভেবেচিন্তে দেখা যাবে। আচ্ছা বলুন তো, গ্যালারির খোঁজ করছিলেন কেন?'

'ছবিটা কোথা থেকে কেনা হয়েছে তা আমাকে জানতে হবে,' রানা বলল। 'আপনাকে সবকথা বলতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কথা দিতে হবে, কাউকে বলবেন না।'

মিটিমিটি হাসছে দীপালি। 'কি এমন গোপন কথা, যে কাউকে বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?'

'মহাভারত অশুদ্ধ হবে না,' বলল রানা। 'কিন্তু জানাজানি হলে আমিই অশুদ্ধ হয়ে যাব। স্রেফ খুন হয়ে যাব আমি।'

রানার দিকে বোকার মত তাকিয়ে রইল দীপালি। 'কি বলছেন আপনি!'

'আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে এখানে এসেছি। কাজটা টপ্ সিক্রেট।' রানা লক্ষ করল উদগ্র কৌতূহলী হয়ে উঠেছে দীপালির চোখমুখ। 'মুক্তিযুদ্ধের সময় আমি এখানে এসেছিলাম। তখন ভয়ঙ্কর ধরনের কিছু লোকের সাথে পরিচয় হয় আমার। তাদের নাম-ঠিকানা কিছুই জানি না। সেই লোকগুলোকে খুঁজে বের করা দরকার। এই ছবিটা যেখানে দেখেছিলাম সেই গ্যালারিটা খুঁজে পেলে যাদের সাথে মেলামেশা করেছিলাম তাদের সাথে দেখা হয়ে যাবার একটা আশা আছে। সুতরাং গ্যালারিটা কোথায় তা না জানলে চলছে না।'

'আপনি কি বাংলাদেশের ডিটেকটিভ কিংবা স্পাই ধরনের কিছু?'

ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল দীপালি।

'এখুনি এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলতে পারি আমার কাজটা বে-আইনী কিছু নয়। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে তো নয়ই।'

অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছে দীপালির মুখ। চাপা একটা উত্তেজনা ফুটে উঠেছে ওর সারা মুখে। রানার একটা হাত ধরে টানল বেডরূমের দিকে। 'আমার সাথে আসুন।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে জানতে চাইল রানা।

'আসুনই না! আপনাকে আমার কালেকশন দেখাব।' পাশের ঘরে একটা কাঁচের আলমারির সামনে টেনে নিয়ে গেল দীপালি রানাকে।

কাঁচের আবরণ ভেদ করে রানার দৃষ্টি গিয়ে পড়ল আগাথা ক্রিস্টি, এলারী কুইন, ইয়ান ফ্লেমিং, জেমস্ হ্যাডলি চেজ, স্ট্যানলি গার্ডনার, রেক্স স্টাউট, জেমস মেয়ো, পিটার স্যাক্সন, রস ম্যাকডোনাল্ড, এ্যালিস্টেয়ার ম্যাকলিন, লেন ডেইটন আর ডেনিস হুইটলির অসংখ্য থ্রিলারের উপর। আলমারি ঠাসা স্পাই থ্রিলার আর ডিটেকটিভ নভেল।

'আমার সমান কালেকশন সারা ভারতবর্ষে আর কারও আছে কিনা সন্দেহ।' দীপালি রানার দিকে তাকিয়ে হাসছে। 'এটুকু গর্বের সাথেই বলতে পারি আমি। পারি না?'

'এত বই সব পড়েছেন আপনি?'

'শুধু পড়িইনি, মুখস্থ আছে।' চোখ টিপল দীপালি। 'রীতিমত গবেষণা করেছি প্রতিটি বইয়ের প্লট, প্রতিটি চরিত্রের মানসিকতা নিয়ে। ওইসব বইয়ের লেখক-লেখিকার চেয়ে নিজেকে আমি কোন অংশে ছোট বলে মনে করি না আজকাল। পড়তে পড়তে দৃষ্টি, বোধশক্তি, চিন্তার ক্ষমতা এত বেশি সচেতন, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে আমার যে, আপনি হয়তো হাসছেন আমার কথা শুনে, কিন্তু সত্যিই মাঝে মাঝে মনে হয় ইচ্ছে করলে আমি নিজেই একজন তুখোড় গোয়েন্দার ভূমিকায় কাজ শুরু করে দিতে পারি। ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের লোকদের সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করছি বেশ কিছুদিন থেকে। আন্ডারগ্রাউন্ডের বহু লোককে চিনি আমি। অর্থাৎ গোয়েন্দা হবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছি আমি গত দু'বছর থেকে। কিন্তু হাতে-নাতে কাজ করার সুযোগ পাইনি।'

'আপনাকে যতই দেখছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি!' রানা বলল!

'ছোটবেলা থেকেই রহস্যের ভক্ত আমি,' দীপালিকে কথায় পেয়েছে। 'রোমাঞ্চের সন্ধান পেলে সেখানে ছুটে যেতে আপত্তি নেই আমার। জানি এ লাইনে পদে পদে বিপদ। একটা মেয়ের জন্যে তো এ লাইন এককথায় ভয়ঙ্কর। কিন্তু ভয়-ডর কিছু নেই আমার। অ্যাডভেঞ্চার ছাড়া জীবনের কোন মূল্য নেই। আপনি কি বলেন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা।

ড্রইং রূমে ফিরে এসে দীপালি বলল, 'পেয়ে গেছি!'

'কি পেলেন?'

'কি চাইব ভেবে পাচ্ছিলাম না। এবার পেয়েছি। কিন্তু ভয় হচ্ছে, আপনি রাজি হবেন কিনা...'

'চেয়েই দেখুন।'

'যতদূর বুঝতে পারছি, আপনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন বাংলাদেশের বিশেষ কোন কাজে। আপনার কাজ অনেকটা ডিটেকটিভের মতই।'

'অনেকটা।'

'ছোটখাট কাজ করতে দেবেন আমাকে? প্লীজ! নিরাশ করবেন না।' দীপালি মিনতির ভঙ্গিতে বলল। 'আমি হয়তো তেমন সাহায্য করতে পারব না। কিন্তু একটা সুযোগ দিয়ে দেখুন না!' অবাক কণ্ঠে বলল, 'হঠাৎ করে আপনার সাথে পরিচয়—পরিচয়টা নাও হতে পারত। আশ্চর্য! এই একটু আগেও ভাবতে পারিনি, আমি যাকে খুঁজছিলাম সেই পরশ পাথর পেয়ে গেছি! চেনার আগেই হয়তো হারিয়ে বসতাম। ভাগ্যিস আপনার জন্যে ওই সামান্য ছবি খোঁজার কাজটা করেছিলাম। আমি কিন্তু ছাড়ছি না আপনাকে। বলুন, দেবেন কাজ?'

'আমি রাজি।' মৃদু হেসে বলল রানা, 'কিন্তু যে কাজ দেব তার বেশি করতে যাবেন না।'

'কী মজা!' বাচ্চা মেয়ের মত হাততালি দিয়ে উঠল দীপালি। 'সত্যিই কাজ দেবেন তো, নাকি ঠাট্টা করছেন?'

'দেব।' রানা বলল, 'তার আগে আপনার ছোট্ট একটা পরীক্ষা নেব।'

'আপনি নয়, তুমি। শিষ্যাকে কেউ আপনি বলে না।'

'বেশ,' হাসল রানা। 'ওই সোফাটায় বসো চুপ করে।'

পরীক্ষার কথায় স্কুলের ছাত্রীর মত মনোযোগী হয়ে উঠল দীপালি। সোজা হয়ে বসল। সপ্রতিভ চোখমুখ।

পকেট থেকে আবার পুতুলটা বের করল রানা, 'বলো তো এই পুতুলটা কি কি কাজে ব্যবহৃত হতে পারে?'

হাত বাড়িয়ে পুতুলটা নিল দীপালি। চোখের সামনে তুলে ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল খানিকক্ষণ।

'চোরাচালানের কাজে সুন্দর ব্যবহার করা যেতে পারে পুতুলটাকে,' বলল দীপালি পুতুলের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে। 'ধরুন, আমি কোকেন বা গাঁজা বা ওই ধরনের কিছু স্মাগল করতে চাই। এখান থেকে বাংলাদেশে নিয়ে যাব। পুতুলের ভেতর জায়গা আছে। ধড় থেকে মুণ্ডুটা আলাদা করে ফেলা যায়।' রানার দিকে চোখ রেখে পুতুলটার মুণ্ডু ধরে চাপ দিল দীপালি। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল ধড় থেকে মুণ্ডুটা। ধড়ের ভিতরটা দেখল সে কয়েক সেকেন্ড। 'এই ফাঁকা জায়গায় কোন নিষিদ্ধ বা গোপনীয় জিনিস থাকলে সহজেই ফাঁকি দেওয়া সম্ভব কাস্টম্‌স্‌কে। অবশ্য সেজন্যে আরও কয়েকটা খালি পুতুল থাকা দরকার সাথে।'

'পাস করেছ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। হাসল। 'তোমাকে শিষ্যা হিসেবে

নেয়া যায়।'

'ধন্যবাদ!' চকচক করছে দীপালির চোখ দুটো খুশিতে।

'এবার আমার কিছু কথা শোনো,' বলল রানা। 'এই পুতুলের ভেতর একটা ম্যাপ ছিল। কোটি কোটি টাকার গুপ্তধন আছে এক জায়গায়। সাগরের নিচে। এই ম্যাপ যার কাছে থাকবে সে ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না সেই গুপ্তধন।'

'বলেন কি!' ঢোক গিলল দীপালি। চাপা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে গাল।

'শোনো। আমি খবর পেয়েছি এই ম্যাপের নকল বিক্রি হয়েছে কোলকাতায়। গুপ্তধন উদ্ধারের প্রস্তুতিপর্ব প্রায় শেষের দিকে। নকল ম্যাপ যারা কিনেছে তারা ঠকেছে, কোন সন্দেহ নেই। উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়েই টের প্যাবে ওরা যে ঘোল খেয়েছে। কিন্তু কাজে নেমে পড়ার আগেই আমি ওদের যে কোন একজনের সাথে দেখা করতে চাই। যে কোন ম্যাপ-ক্রেতা হলেই চলবে। বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি,' বলল দীপালি। 'আমার মনে হয় এ ব্যাপারে বেশ খানিকটা সাহায্য করতে পারব আমি।'

'যেমন?' সাগ্রহে জানতে চাইল রানা।

'আমার এক পরিচিত লোক আছে। বেশ ভাল লোক। কিন্তু তার পেশা ইত্যাদি সম্পর্কে কাউকে সে কিছু বলে না, বলবেও না।'

'তা জানার দরকারও নেই আমার,' রানা বলল। 'তোমার এই পরিচিত লোক কি রকম সাহায্য করতে পারবে বলে আশা করো তুমি?'

'ঠিক বলতে পারছি না। আগে তার সাথে কথা বলে দেখি। ভদ্রলোক কোলকাতার বেয়াড়া জগতের কোথায় কি ঘটছে না ঘটছে সব খবর রাখে। ও হয়তো আমাদের জানাতে পারবে নকল ম্যাপ কে কিনেছে, কোথা থেকে কিনেছে। রাত আটটার দিকে আসুন না কারনান হোটেলে?'

'গুড!' খুশি হলো রানা, 'নকল ম্যাপ কিনেছে এমন একজন লোক পেলেই ফিফটি পারসেন্ট কাজ হয়ে যাবে। কার কাছ থেকে কিনেছে সেটা বের করা খুব একটা অসুবিধে হবে না।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বলল দীপালি। 'দারুণ লাগছে কিন্তু আমার! বই-পুস্তকে পড়া গল্প নয়, বাবা, সত্যিকারের কাজ! উফ্! বিশ্বাসই হচ্ছে না…! সত্যিকার একজন গোয়েন্দার সহকারী!'

খিলখিল করে হেসে উঠল দীপালি।

হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এল সে।

'চা খাবেন, না কফি?'

'কিছুই না। উঠব এখন।' উঠে দাঁড়াল রানা। 'দেখা হবে, আটটায়।'

আট

দীপালির অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়েই পড়ল রানা পুলিসের খপ্পরে।

ট্যাক্সির আশায় অপেক্ষা করছিল, সামনে এসে দাঁড়াল একটা জীপ। ড্রাইভার ও তার পাশে বসা প্রকাণ্ডদেহী সার্জেন্ট নড়ল না, দুজন সেপাই নামল।

'আপনার নাম রাশেদুজ্জামান খান?' প্রশ্ন করল একজন।

অবাক হয়ে সায় দিল রানা।

'ভদ্রতা মারাচ্ছিস কেন?' গর্জে উঠল সার্জেন্ট। 'তুলে আন্ শালাকে।'

একটু ইতস্তত করল সেপাই। অকারণে হঠাৎ করে একজন ভদ্রলোকের সাথে দুর্ব্যবহার করতে বাধছে ওর। তবু গলায় যতটা সম্ভব কড়া ভাব এনে বলল, 'আপনাকে থানায় যেতে হবে।'

'কেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'আবার, কেন!' তেড়ে উঠল সার্জেন্ট। নামছে জীপ থেকে। 'কেন জিজ্ঞেস করছে আবার, কুত্তার বাচ্চা!' রানার সামনে এসে দাঁড়াল পাহাড়ের মত। কঠোর চোখমুখ।

এটা ইন্সপেক্টর ভট্টর সাথে চটাচটির ফল কিনা চট করে ভেবে নিল রানা একবার। নামটা ঠিক আছে যখন, ভুল করে ওকে ধরা হচ্ছে না। কিন্তু কেন? সার্জেন্টের দিকে একনজর চেয়েই বুঝতে পারল সে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে করতে হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হয়েছে লোকটা। যুক্তি-তর্কের ধার এ লোক ধারবে না। তবু আশপাশে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে, সেই ভরসায় প্রশ্ন করল রানা, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে? এ রকম দুর্ব্যবহার...'

'শাট আপ!' খপ্ করে ধরল লোকটা রানার কোটের কলার। ঝাঁকি দিল জোরে।

মারতে গিয়েও মারল না রানা। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়। বিদেশ বিভুঁয়ে পুলিস অফিসারের গায়ে হাত তুললে মহা ফ্যাকড়ায় জড়িয়ে যেতে হবে।

হ্যাঁচকা টানে জীপের পিছন দিকটায় চলে এল রানা।

'দেখুন,' বলল রানা, 'আপনি একজন বিদেশীর গায়ে...'

চটাশ্ করে প্রকাণ্ড এক চড় পড়ল রানার গালে। বোঁ করে ঘুরে উঠল মাথাটা। কিছুটা নিজের চেষ্টায়, কিছুটা সেপাইদের ধাক্কায় উঠে গেল সে জীপের মধ্যে। চলতে শুরু করল জীপ।

মুচিপাড়া সেকশনের সামনে থামল জীপ। অফিস কামরার মধ্যে দিয়ে রানাকে নিয়ে আসা হলো একটা প্রায় আসবাববিহীন ছোট্ট কামরায়। একমাত্র চেয়ারটা দখল করল সার্জেন্ট। হুকুম করল, 'পকেটে যা যা আছে বের করে

ওই বেঞ্চের উপর রাখো।'
'দেখুন, মস্ত কোন ভুল হচ্ছে…'
'শাট আপ! যা বলছি করো।'
কথা না বাড়িয়ে আদেশ পালন করল রানা। ভাগ্যকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিল পিস্তলটা হোটেলে রেখে আসার জন্যে। পাসপোর্ট, মানিব্যাগ, সিগারেটের প্যাকেট, রুমাল, লাইটার, সব বেঞ্চের উপর নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ভুরু কুঁচকে উঠল সার্জেন্টের।
'কোথায় গেল?'
'কি কোথায় গেল?'
'ন্যাকামি হচ্ছে, না!' একজন সেপাইকে নির্দেশ দিল, 'সার্চ করো।'
তৈরি ছিল লোকটা। সার্চ শুরু করল। পেল না কিছুই।
'নেই, স্যার।'
'কি খুঁজছিলেন জানতে পারি?'
'পুতুলটা কোথায়? পুতুলের ভিতর যে ম্যাপটা ছিল, সেটা?'
ভিতর ভিতর ডিগবাজি খেয়ে উঠল রানা। বলে কি! পুলিস এসব কথা জানল কি করে? কাংকারিয়ার লোক? নজর রাখা হচ্ছিল ওর উপর?
'পুতুল!' রানা যেন আকাশ থেকে পড়ল। 'ম্যাপ! কি বলছেন? আপনার কথা বুঝতে পারছি না আমি।'
পুতুলটা দীপালির ঘরে ফেলে এসেছে রানা।
'বুঝতে পারছ না?' উঠে দাঁড়াল লোকটা। 'আর পিস্তলটা?'
'পিস্তল! কি বলছেন এসব?'
'পিস্তল আর পুতুল কোথায় রেখেছিস জানতে চাই আমি, কুত্তার বাচ্চা!' রানার মুখের কাছে মারমুখো হয়ে সরে এল সার্জেন্ট। ঘুসি পাকিয়ে রানার মুখের কাছে তুলল হাতটা। 'ছেঁচে ফেলব! পিষে ফেলব একেবারে। আমার নাম সার্জেন্ট চোপরা। আজ পর্যন্ত কোন শুয়োরের বাচ্চা ফাঁকি দিতে পারেনি আমাকে। কোথায় রেখেছিস ওগুলো বল, শালা!' মাঝারি একটা ঘুসি মারল রানার নাকের উপর।
নিজের অজান্তেই হাত উঠে যাচ্ছিল রানার, সংবিৎ ফিরে পেয়ে সামলে নিল।
ময়লা দাঁত বের করে ভয়ঙ্কর হাসি হাসল সার্জেন্ট।
'মার, মার আমাকে! মেরেই দ্যাখ!' রানাকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য গুঁতো মারল ওর পেটে। 'দেখছিস কি, মার…'
দাঁতে দাঁত চেপে সামলে নিল রানা।
'ভুল করছেন আপনি, সার্জেন্ট,' বলল রানা। 'লোক চিনতে ভুল হয়েছে আপনার। ক্ষমতার অপব্যবহার করলে শেষ পর্যন্ত মঙ্গল হয় না। আপনি অমঙ্গল ডাকছেন।'
'যা যা, কুত্তার বাচ্চা! উপদেশ দিতে এসেছে আবার। ভাগ! দূর হ আমার চোখের সুমুখ থেকে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বেঞ্চের উপর থেকে জিনিসগুলো তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোল রানা। খানিকটা আশঙ্কা করলেও কল্পনা করতে পারেনি সে অত ভারী শরীর নিয়ে এমন বিদ্যুৎগতিতে দরজার কাছে এসে পড়বে চোপরা। একপাশে সরে দাঁড়াবার আগেই ওর শিরদাঁড়ার সর্বশেষ গিঁটের উপর লাথি মারল বুট দিয়ে। ছিটকে গিয়ে প্যাসেজ পেরিয়ে ওপাশের দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে হাত-পা ছড়িয়ে মেঝেতে পড়ল রানা। মুখটা নীল হয়ে গেছে ব্যথায়।

প্যাসেজে বেরিয়ে এসে আর একটা লাথি মারল চোপরা রানার পিছন দিকটায়। নুয়ে পড়ে চাইল রানার দিকে, 'কি করতে পারিস করগে যা, শুয়োরের বাচ্চা! ভাগ্ এখান থেকে!'

অনেক কষ্টে উঠে দাঁড়াল রানা। টলতে টলতে এগোল প্যাসেজ ধরে। দাউ দাউ আগুন জ্বলছে ওর মাথার মধ্যে।

'খুন করব!' মনে মনে প্রতিজ্ঞা নিল সে।

কেউ অনুসরণ করছে না। রিস্টওয়াচ দেখল রানা। দুপুর তিনটে। রাত আটটায় হোটেল কারনানে অপেক্ষা করবে দীপালি ওর সবজান্তা বন্ধুটিকে নিয়ে। হাতে সময় আছে প্রচুর।

নিজের হোটেলে ফিরল রানা।

'এই যে, সম্মানীয় অতিথি···'

বুড়োর বক্তব্য শোনার জন্যে দাঁড়াল না রানা। দ্রুতপায়ে চলে গেল লিফটের দিকে। দাঁতহীন মুখটা হাঁ হয়ে রইল। অবাক হয়ে দেখছে লোকটা রানাকে।

ঘরে ফিরে প্রথমেই পিস্তলটা পরীক্ষা করল রানা, তারপর জামাকাপড় ছেড়ে পাঁচ মিনিট শবাসনে শুয়ে স্থির করে নিল মনটা। তারপর তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার।

সেলিনার ঘরে লাইন পেতে দেরি হলো না।

'সেলিনা?'

'সারাদিন তোমার জন্যে সেজেগুজে বসে আছি···' সেলিনার কণ্ঠে অনুযোগ।

'ওসব কথা পরে,' রানা বলল। 'মন দিয়ে আমার কথা শোনো। পুলিস লেগেছে পিছনে। ম্যাপটা চাইছে। তোমার হোটেলের সন্ধান এখনও পায়নি, তবে পেতে চেষ্টা করলে দেরিও হবে না। তুমি আধঘণ্টার মধ্যেই ওখান থেকে বেরিয়ে পড়ো। অন্য কোন হোটেলে ওঠো। আজ রাত দশটার পর আমাকে ফোন করে ঠিকানাটা জানিয়ো। ফোনে আমাকে না পেলে জানিয়ো না কাউকে। বুঝতে পেরেছ?'

'তুমি আমার কাছে চলে এসো, রাশেদ!' সেলিনা উৎকণ্ঠিত। 'বিপদে জড়িয়ে পড়েছ তুমি। পুলিস পেছনে লাগা মানে তো ভয়ানক ব্যাপার! কি করেছ তুমি?'

'কিছুই করিনি,' রানা বলল, 'এখন আসতে পারব না। রাতে দেখা হবে।

তখন সব বলব। দুশ্চিন্তা কোরো না। আর তোমার কাছে যে জিনিসটা রেখে এসেছি…'

'ওটা এমন এক জায়গায় রেখেছি, কারও সাধ্য নেই যে খুঁজে বের করে।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। আবার তুলল কানে। একটা বিশেষ নাম্বারে ডায়াল করে ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়েই কেটে দিল কানেকশন।

হোটেল কারনান।

হুইস্কির গ্লাসটা ঠোঁটে ঠেকাল রানা।

'মাফ করবেন…'

চোখ তুলল রানা। লোকটার চুলগুলো লক্ষ্য করল ও প্রথমেই। শজারুর কাঁটার মত শক্ত, দাঁড়িয়ে আছে খাড়া হয়ে সারা মাথায়। শক্ত, সমর্থ চেহারা। মুখে হাসি লেপটে আছে সর্বক্ষণ।

'দীপালির একটু দেরি হবে আসতে।' লোকটার পরনে ট্রাউজার, হলুদ হাফহাতা শার্ট। 'মি. রাশেদ খান?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'বসুন।'

'আমার পরিচয়,' লোকটা মুখোমুখি চেয়ারটা দখল করল, প্রশান্ত। সম্পূর্ণ নামটা জানাল না। 'দীপালি রায় সাহায্যের অনুরোধ জানিয়েছে আমাকে। এখানে আমরা নিরাপদে…'

কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল শজারু মোটাসোটা ওয়েটারকে এগিয়ে আসতে দেখে।

অর্ডার দিল রানা।

'কাজের কথা এখুনি শুরু করা যেতে পারে, কি বলেন?' প্রশান্ত বলল। 'দীপালি যতটুকু বলেছে—আপনার কাছে একটা ম্যাপ আছে। ঠিক, মি. রাশেদ?'

'হ্যাঁ,' জানাল রানা।

'সাথে করে এনেছেন সেটা?'

'না।'

'দরকারও নেই,' প্রশান্ত বলল। 'দীপালি মোটামুটি একটা ধারণা দিয়েছে আমাকে। আপনার ম্যাপটার মত দেখতে কিছু নকল ম্যাপ কোলকাতায় বেচাকেনা হচ্ছে—আপনি যে কোন একজন ক্রেতা বা বিক্রেতার সন্ধান চান। ঠিক?'

'ঠিক।'

'ম্যাপটা কিসের সন্ধান দিতে পারে?'

'সোনা।'

'কত?'

'আড়াই টন।'

'মাই গড!' প্রায় আঁৎকে উঠল প্রশান্ত। 'বঙ্গোপসাগরে ডুবে যাওয়া জাহাজের কথা বলছেন আপনি, তাই না? মুক্তিযুদ্ধের সময় একটা পাকিস্তানী

জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়েছিল, তাতে ছিল এই আড়াই টন সোনা, ঠিক না?'

'এত খবর জানলেন কোথায়?' সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন করল রানা।

হাসল প্রশান্ত। 'আমি কেন, এই অঞ্চলের টিকটিকি, মশা, মাছি, তেলেপোকারাও এ খবর রাখে। তিনটে ম্যাপ বিক্রির খবর আমি জানি। আপনি বলছেন, সেগুলো নকল? আপনারটা…'

'আসল ম্যাপ।' হুইস্কিতে চুমুক দিল রানা।

'আপনার ম্যাপটা যদি আসল হয়ে থাকে…' চিন্তা করছে প্রশান্ত। 'আমি এমন একজন লোককে জানি যে আপনাকে এই ম্যাপের জন্যে সবচেয়ে বেশি টাকা অফার করবে। সে আবার ডোপ সিন্ডিকেটের হেড। নাম ঠাকুর।'

'শুধু ঠাকুর?'

'ঠাকুরের আগে পিছে কি আছে তা কেউ জানে না,' প্রশান্ত বলল। 'ঠাকুর বললেই সবাই ঢোক গেলে এবং চেনে।'

'ইতিমধ্যেই জমিয়ে ফেলেছ, কেমন!'

মিষ্টি গলা শুনে তাকাল রানা। দ্রুত হেঁটে আসছে দীপালি। দেরির কৈফিয়ত দেয়ার জন্যে কিছু বলতে যাচ্ছিল, বসবার ইঙ্গিত করে রানা বলল, 'বসো চুপচাপ। জরুরী কথা হচ্ছে।'

'বাহ্! কথা শুরু হয়ে গেছে তাহলে!' বসে পড়ল চেয়ার টেনে।

'শুরু হয়েছে, কিন্তু শেষ হয়নি,' বলল রানা। প্রশান্তের দিকে চাইল, 'তা এই ঠাকুর মশায়ের সাথে যোগাযোগের উপায়টা কি?'

'উপায় কি তা আমি নিজেই জানি না।' প্রশান্ত বলল। 'তবে একজন লোককে সাহায্য করতে বলতে পারি আমি। সে যদি আপনার কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়, বিশ্বাস করে, তাহলে ঠাকুরের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতেও পারে।'

'লোকটা কে?'

'প্রফেসার।'

'প্রফেসার?'

'শুধু প্রফেসার!' হাসল প্রশান্ত। 'এরও আগে পিছে কিছুই নেই। বুড়ো। হোটেল রেস্তোরাঁয় চা খায় আর বই পড়ে। আর কিছু খেতে দেখিনি লোকটাকে কোনদিন, চা ছাড়া।' একটু থেমে বলল। 'হি ইজ এ গো-বিটুইন। শুনেছি লোকটা প্রেমপত্র পৌঁছে দেয়া থেকে শুরু করে গুম বা খুন করার বন্দোবস্ত করে দেয়া পর্যন্ত—সব করে। বড় বিচিত্র, তাই না? কত রকম চরিত্র…'

'কোথায় পাব বুড়ো প্রফেসারকে?'

'ব্যবস্থা করতে হবে আমাকে।' কয়েক সেকেন্ড ভ্রূ কুঁচকে চিন্তা করে প্রশান্ত বলল, 'ঠিক আছে, আগামীকাল সকালে এখানেই আসতে বলি তাকে। ওর টেবিলের উপর তিনটে বই থাকবে। আপনার জন্যে অপেক্ষা করবে। বেলা দশটায়, কেমন?'

'ধন্যবাদ।' রানা বলল। 'কতটুকু বলব প্রফেসারকে?'

'যত কম পারেন। যতটা না বললেই নয়। কিন্তু ঠাকুরের সাথে পরিচিত হওয়াটাই যখন আপনার উদ্দেশ্য, তখন বেশ অনেকখানিই বলতে হবে বলে মনে হয়। আপনাকে ভাল করে বাজিয়ে না দেখে ছাড়পত্র দেবে না সে। পাকা ঘুঘু! কোন রকম সন্দেহজনক কিছু দেখলেই টুপ করে ডুব দেবে—আর পাবেন না খুঁজে।'

'ঠিক আছে,' রানা বলল। 'সন্দেহের কিছুই পাবে না সে আমার মধ্যে। আমি জেনুইন।'

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল প্রশান্ত। 'উঠি আমি। পৌনে ন'টা বাজে। দেরি করলে আজ আর পাব না প্রফেসারকে।'

'সেকি! খাবেন না?'

'খেতে বসলে দেরি হয়ে যাবে। আমার ভাগটা দীপালি খেয়ে নেবেখন।' হাসল। 'তাতেই পেট ভরে যাবে আমার। চলি, দেখা হবে আবার।'

বলিষ্ঠ, আত্মবিশ্বাসী পা ফেলে বেরিয়ে গেল প্রশান্ত। যতক্ষণ দেখা গেল ওর দিকে চেয়ে থেকে দীপালির দিকে ফিরল রানা। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'অদ্ভুত লোক!'

ট্রে সাজিয়ে বিরিয়ানী নিয়ে এল বেয়ারা।

নয়

প্রফেসারকে দেখেই চিনল রানা। মাথা নিচু করে খবরের কাগজ পড়ছে। টেবিলের উপর দেখা যাচ্ছে তিনটে বই। পাশে একটা শূন্য চায়ের কাপ। ছোটখাট মানুষটা, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। দাড়ি আর মাথার চুল সবই প্রায় পাকা। মলিন বেশ।

'প্রফেসার?' প্রশ্ন করে একটা চেয়ার পিছনে টানল রানা। আশপাশের টেবিলগুলো খালি, লক্ষ করল ও। 'ক্যান আই অফার ইউ আ ড্রিঙ্ক?'

'জাস্ট হ্যাড আ কাপ অফ টী, থ্যাঙ্ক ইউ। প্লীজ সিট ডাউন মি. রাশেদ।' রানার দিকে চোখ তুলে তাকাল না প্রফেসার।

বেয়ারা এগিয়ে আসছিল, হাতের ইশারায় চলে যেতে বলল প্রফেসার বই থেকে মুখ তুলে। তাকাল রানার দিকে।

'শুনেছি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন আপনি।'

'ঠিকই শুনেছেন,' বলল রানা।

'আপানার পেশা?'

'কমার্শিয়াল আর্টিস্ট,' রানা বলল। 'মুক্তিযুদ্ধে ছিলাম। স্বর্ণবাহী জাহাজটা ডুবতে দেখেছিলাম আমি।'

'পাসপোর্ট?' হাত পাতল প্রফেসার।

পকেট থেকে পাসপোর্টটা বের করে দিল রানা। মনোযোগ দিয়ে দেখল

প্রফেসার। 'ম্যাপটা কোথায়?'

'নিরাপদ জায়গাতেই আছে।'

'আপনি দাবি করছেন, আপনার ম্যাপটা আসল, অন্যগুলো নকল?'

'আমারটা যে আসল তাতে কোন সন্দেহই নেই। লেফটেন্যান্ট আহসানের সাহায্যে আমিই তৈরি করেছিলাম ওটা। কিন্তু অন্যগুলো নকল কিনা হলপ করে বলতে পারছি না। দেখলে বলতে পারব। যতদূর সম্ভব নকল—কারণ, আমি ছাড়া আর কারও কাছে আসল ম্যাপ থাকবার কথা নয়।'

'আগরতলায় রামরাম কাংকারিয়াকে আপনারা একটা ম্যাপ এঁকে দিয়েছিলেন। সেটা···'

'সেটা ভুল ম্যাপ। ইচ্ছে করেই ভুল তথ্য দিয়েছিলাম আমি আর আহসান যুক্তি করে।'

মিনিট দুয়েক চুপচাপ চিন্তা করল প্রফেসার।

'কত সোনা?'

'আড়াই টন। আনুমানিক।'

'ম্যাপটা দেখতে চাই।'

'সাথে করে আনিনি,' রানা বলল, 'তবে কেউ দেখতে চাইলে সানন্দে দেখাব। অবশ্যই তাকে পার্টি হতে হবে।'

'কত চান ম্যাপটার জন্যে?' মৃদু হাসল। 'চায়ের অর্ডার দিতে পারেন।'

দূর থেকেই দু'আঙুল তুলে চায়ের অর্ডার দিল রানা। একটু সামনে ঝুঁকে বলল, 'কত চাইব সেটা পার্টির সাথে আলোচনার বিষয়। সবচেয়ে বেশি দাম যে দেবে আমি তাকেই দেব। আপনি যদি কোন কাস্টোমার যোগাড় করে দিতে পারেন তাহলে আপনাকে দেব আড়াই পার্সেন্ট।'

'বিশ।'

'পাঁচ।'

'দশ।'

'বেশ, তাই।' রানা রাজি হলো।

'প্রকৃতপক্ষে এই জাহাজটা ডুবে যাওয়ার খবর পেয়েছি আমি একাত্তরের নভেম্বরে।' প্রফেসার বলল। 'আবার অনেকে বলে সব বাজে গল্প, জাহাজটার অস্তিত্বই ছিল না কোন কালে।'

হেসে উঠল রানা, 'ছিল। আমি সাক্ষী। নিজের চোখে দেখেছি আমি।'

'আপনার ম্যাপটা যদি আসল হয় তাহলে একজন মানুষকে আমি জানি যে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ দেখাবে ওটা কেনার জন্যে···'

'ঠাকুর?'

'প্লীজ!' প্রফেসার চাপা স্বরে বলল, 'নো নেমস্।'

'আপনি তার সাথে আমার যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারেন?'

'পারি,' এক ঢোকে চা শেষ করে বলল প্রফেসার। 'কুড আই হ্যাভ সাম মানি?'

'মানি!'

'ফর দ্য ট্রাবল! আই মাস্ট কল সামওয়ান সামহোয়ের।'

একটা দশ টাকার নোট বের করে টেবিলে রাখল রানা। শীর্ণ হাতে তুলে নিল সেটা প্রফেসার। উঠে দাঁড়াল। 'অপেক্ষা করুন, আসছি।'

দশ মিনিট পর ফিরে এল প্রফেসার।

'কখন দেখা হবে ঠাকুর···আপনার বন্ধুর সাথে?'

'আজ রাতে।' প্রফেসার একটা বইয়ের ভিতর থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে বলপয়েন্ট পেন্সিল দিয়ে লিখতে শুরু করল। 'এই ঠিকানা বরাবর আপনি যাবেন। একা। আই রিপিট, একা। অ্যাট মিডনাইট। ম্যাপটা সাথে নিতে ভুলবেন না।'

রোমাঞ্চ অনুভব করছিল রানা। আকাশে মেঘের চাপা গর্জন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই সাথে বৃষ্টি। ঝম ঝম ঝম ঝম। শীত নামাচ্ছে।

লম্বা লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে ছুটে চলেছে রানার ভাড়া করা অ্যামব্যাসাডর। ভিউ মিররে ঘন ঘন তাকাচ্ছে ও। না, কেউ অনুসরণ করছে না। কিন্তু করলেই যেন ভাল হত। বেশ জমত অ্যাডভেঞ্চারটা।

ল্যান্সডাউন রোডের শেষ মাথায় ঠাকুরের বাড়ি। গেট পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়ি বারান্দা। রানা লক্ষ্য করল অন্ধকার বাগানে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। গায়ে ওয়াটারপ্রুফ। ঠাকুরের লোক। বামদিকের বাগানে আরেকজনকে আবিষ্কার করল রানা। কড়া পাহারা।

গাড়িটা থেমে দাঁড়াতেই একটা থামের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একজন সশস্ত্র লোক। হাতে একটা মেশিন পিস্তল। দরজার পাশে এসে দাঁড়াল লোকটা। 'মি. রাশেদ?'

'হ্যাঁ।' নামল রানা।

বিনা বাক্যব্যয়ে টিপে দেখল লোকটা রানাকে। পিস্তলটা বের করে নিয়ে টিপ দিল দেয়ালের গায়ে বসানো সাদা বোতামে। বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে একটা গর্জন ভেসে আসতেই চেঁচিয়ে বলল, 'দরজা খোল, জানোয়ার।'

জানোয়ার! মানুষের নাম জানোয়ার হয় নাকি!

ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটা। অবাক হয়ে চেয়ে রইল রানা। সত্যিই লোকটা মানুষ নয়, নামের সাথে আশ্চর্য মিল ওর চেহারার। শিম্পাঞ্জী দেখেছে রানা, গরিলাও দেখেছে। এই দুই জন্তুর সাথে আত্মীয়তা আছে লোকটার। খুব সম্ভব পিসতুত ভাই হবে। এত প্রকাণ্ড বুকের ছাতি যে রানা সেখানে অনায়াসে পদ্মাসনে বসতে পারে।

দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল জানোয়ার। পা বাড়াতে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইল রানা। দরজা খোলা হয়েছে কিন্তু সামনের প্রকৃত বাধাটা সরে যায়নি। কুঁতকুঁতে চোখে আপাদমস্তক লক্ষ করছে রানাকে।

'যেতে দাও, জানোয়ার,' বলল গার্ড। 'ওপরে নিয়ে যাও একে।'

সরে দাঁড়াল জানোয়ার, রানা ঢুকতেই বন্ধ করে দিল দরজা।

সামনেই সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। আগে আগে চলল রানা, পিছনে

নিঃশব্দ পা ফেলে উঠে আসছে জানোয়ার। ঘাড়ের পিছনটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল রানার।

জানোয়ারের ইঙ্গিতে কয়েকটা ঘর পেরিয়ে একটা বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ঘাড়ের পিছনে ফোঁসফোঁস নিঃশ্বাস ছাড়ছে জানোয়ার। হাত বাড়িয়ে একটা বোতল স্পর্শ করে নামিয়ে নিল হাত। রানা লক্ষ করল আঙুলের নখগুলো ওর ইঞ্চিদেড়েক লম্বা।

'ভেতরে আসুন, মি. রাশেদ,' ভারী কণ্ঠে আদেশ এল।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই রানা দেখল তিনজোড়া চোখ ওর উপর নিবদ্ধ।

দরজার দিকে মুখ করে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে একজন লোক। লোকটাকে দেখেই ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। কে লোকটা!

লোকটার চেহারা দেখে প্রথমেই মনে হয় পুলিস কিংবা আই, বি-র লোক। নিচু দিকের কেউ নয়—অফিসার। মুখের চেহারা, কপালের ভাঁজ, চোখের চাহনি প্রভুসুলভ—মানুষের সাথে দুর্ব্যবহার করে অভ্যস্ত। কে এই লোক? কাংকারিয়া নয় তো?

সার্জেন্ট চোপরার কথা মনে পড়ে গেল রানার। এরই নির্দেশে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওকে?

ডান পাশের দুটো চেয়ারে দু'জন লোক। ঠাকুর কোন্ লোকটা অনুমান করার চেষ্টা করল রানা। গান্ধী টুপি পরা মাঝ বয়েসী লোকটার ঠোঁটে সিগারেট জ্বলছে। মিষ্টি একটা গন্ধ সারা ঘরময়। এই লোকই ঠাকুর। মারিজুয়ানা টানছে সিগ্রেটে ভরে। ডোপ সিন্ডিকেটের হেড। কিন্তু মাথায় গান্ধী টুপি!

ঠাকুরের পাশের লোকটা সবিশেষ বৈচিত্র্যের দাবিদার। ক্লিন শেভ। মাথায় ঢেউ খেলানো ব্যাকব্রাশ চুল। গালে, মুখে, কপালে কোথাও এতটুকু ভাঁজ নেই, রেখা পড়েনি। অভিব্যক্তিহীন পাথরের মুখের মত।

'আসুন, মি. রাশেদ!' রানা ঠাকুর বলে অনুমান করেছে যাকে সেই প্রথম ভাঙল অস্বস্তিকর নীরবতা। 'আমরা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি।'

আবার নিস্তব্ধতা নামল ঘরের ভিতর। কেউ আঙুল মটকালে বোমা ফাটার মত শব্দ হবে। পা বাড়াল রানা। পিছনে না তাকিয়েও বুঝতে পারল সে ওর পিছনে ঠিক একফুটের মধ্যে রয়েছে জানোয়ার।

রিভলভিং চেয়ারের মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসল রানা।

'পরিচয়ে দরকার নেই,' ঠাকুরই বলল, 'আলোচনা শুরু করা যেতে পারে, কেমন?'

'না' বলল রানা। 'পরিচয় না জেনে আমি আলোচনা করতে পারি না।'

'মিথ্যে পরিচয়ও দিতে পারি আমরা।' ঠাকুরের পাশে বসা লোকটা বলল। 'তার চেয়ে কি পরিচয় না দেয়াটাই ভাল নয়?'

রানা হাসল নিঃশব্দে, 'মিথ্যে পরিচয়টাও কিন্তু এক ধরনের পরিচয়। সেটা পেলেও চলবে আমার।'

'আমার নাম ঠাকুর, আপনি আমার সাথে আলাপ করতে এসেছেন। সোনার ব্যাপারে আমরা তিনজন একসাথে কাজ করছি। আমার পাশে যিনি বসে রয়েছেন ইনি নটরাজ নামে পরিচিত। আর তৃতীয়জনকে আপনি চেনেন। আগরতলায় একবার পরিচয় হয়েছিল আপনাদের। কি নাম ওর বলুন তো?'

'রামরাম কাংকারিয়া।' অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল রানা।

নড়ে উঠল রিভলভিং চেয়ারটা। রানার মুখে নিজের নাম শুনে প্রায় চমকে উঠল লোকটা। কিন্তু সামলে নিল মুহূর্তে। পনেরো সেকেন্ড পিন পতন স্তব্ধতা। তারপর জেরা শুরু করল নটরাজ।

কত সালে জন্মেছে রানা, জন্মস্থানের নাম, বাপের নাম, মায়ের নাম, ছেলেবেলার ঘটনা, কোথায় পড়াশোনা করেছে, পেশা, মুক্তিযুদ্ধে কত তারিখে যোগ দিয়েছিল, কোথায় কোথায় অপারেশন করেছে, কবে দেখেছে জাহাজটা ডুবতে, কয়টার সময়, বর্তমানে কি করে—এমনি হাজারটা প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করল রানা।

'বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করবেন না। এটা আমার অনুরোধ।'

'দুঃখিত,' ঠাকুর বলল, 'নটরাজ সন্তুষ্ট হয়ে থাকলে কাজের কথা হোক এবার।'

শুরু করল নটরাজই। চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল, 'আপনি বলতে চাইছেন অরিজিনাল ম্যাপটা আপনার কাছে আছে?'

'কোন সন্দেহ নেই তাতে।' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল রানা।

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল নটরাজ।

'ধীরে, নটরাজ!' অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠেছে ঠাকুর। রানার দিকে ফিরল সে, 'মি. রাশেদ, ম্যাপটা আপনি সাথে করে নিয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই?'

'না।'

'না?' ঠাকুরের চোখমুখ কুঞ্চিত হলো। 'সাথে করে নিয়ে আসার কথা ছিল না কি?'

'খেপেছেন? ওটা রেখে আমার কানটা ধরে বের করে দিলে করবার কি থাকত আমার? মিস্টার কাংকারিয়া তো গতকাল প্রায় সেই ব্যবস্থাই করেছিলেন। চোপরাকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন আমার পেছনে।'

'তার মানে!' সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে কাংকারিয়ার দিকে চাইল ঠাকুর।

'বাজে কথা!' কঠোর দৃষ্টিতে রানার চোখের দিকে চাইল কাংকারিয়া। 'এভাবে আমাদের মধ্যে ফাটল ধরাতে পারবেন না। প্রমাণ আছে কোন?'

'না। কোন প্রমাণ নেই। জাস্ট অনুমান। যাই হোক,' ঠাকুরের দিকে ফিরল রানা, 'আগে চুক্তি হোক, দাম ঠিক হোক, তারপর ম্যাপ দেখতে পাবেন। সবচেয়ে আগে আমার জানা দরকার—আপনাদের তিনজনের মধ্যে কেউ আমার ম্যাপের ক্রেতা আছেন কিনা? এবং থাকলে ক্রেতা আপনাদের মধ্যে কে?'

'আমি,' ঠাকুর বলল, 'কিনব আমি। কিন্তু মি. রাশেদ, আমার ধারণা আপনার ম্যাপ অনেক আগেই আমার হাতে পৌঁচেছে। আমি আপনার

ম্যাপের ডুপ্লিকেট কপির কথা বলছি।'

'ডুপ্লিকেট কপি সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'আপনার কাছে যদি কোন ম্যাপ থাকে তাহলে হলপ করে বলতে পারি, সেটা নকল।'

'যদি বলি ওরকম তিনটে ম্যাপ আছে আমাদের তিনজনের হাতে?'

'তাহলে বলব তিনটেই নকল।'

নটরাজের দিকে চাইল ঠাকুর। গর্জে উঠল লোকটা। 'ওর কথা বিশ্বাস করতে পারো না তুমি, ঠাকুর। লোকটা মিথ্যে কথা বলছে।'

'মিথ্যে বলে আমার লাভ?'

'তোমার ম্যাপ নকল!' জোরের সাথে বলল নটরাজ। 'তুমি বোকা বানিয়ে ওটা বিক্রি করতে চাইছ ঠাকুরের কাছে।'

রানা হাসল, 'তুমি জানলে কি করে? কি করে জানলে তোমাদেরগুলো আসল?'

ঠাকুর বলল, 'ম্যাপের চেহারা দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আমরা তিনজন একই সোর্স থেকে, অর্থাৎ, একই ব্যক্তির তৈরি ম্যাপ পেয়েছি। সেই সোর্সের সাথে নটরাজ ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। নটরাজের আস্থা আছে তার ওপর। ওর বিশ্বাস, এই লোক সন্দেহের অতীত।'

রানা চাইল নটরাজের দিকে। বাঁকা একটু হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

'ভালই ব্যবসা খুলেছেন, মি. নটরাজ। একাধিক ম্যাপের ব্যাপারটাও আমার কাছে তেমন পরিষ্কার হচ্ছে না। কেন এই বিশ্বস্ত ব্যক্তি তিনজনের কাছে একই ম্যাপের তিন কপি বিক্রি করেছেন তা আপনারাই জানেন। তবে আমি আপনার বা আপনার বিশ্বস্ত ব্যক্তির ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। দুঃখিত।'

নটরাজ চেয়ে রইল। শিরশির করে উঠল রানার শরীর। লোকটা হিংস্র হয়ে উঠছে। জ্বলছে চোখ দুটো। যে-কোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটিয়ে বসতে পারে এ লোক চাপে পড়লে।

'উত্তেজিত হয়ো না, নটরাজ। কথাটা কি ভদ্রলোক অযৌক্তিক বলেছেন?' এতক্ষণে মুখ খুলল কাংকারিয়া।

'সম্পূর্ণ অযৌক্তিক!' ফুঁসে উঠল নটরাজ। 'এর কাছে কোন ম্যাপ নেই। থাকতে পারে না। আমি জানি।'

রানা বলল, 'মি. ঠাকুর, আপনার ম্যাপটা আমাকে একটু দেখাতে পারেন? একনজর দেখলেই বলে দিতে পারব আমি আসল না নকল।'

'অবশ্যই।' ঠাকুর উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে।

'যাকে তাকে ম্যাপ দেখানো কি ঠিক হচ্ছে, ঠাকুর?' কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করল নটরাজ।

'অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখানোই তো ভাল মনে হয়। অন্তত ক্ষতি নেই।' কাংকারিয়ার দিকে চাইল সে। 'আপনি কি বলেন?'

কাংকারিয়ার সায় পেয়ে বেরিয়ে গেল ঠাকুর ঘর ছেড়ে।

ঠিক সেই সময় রানার ঘাড়ে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল কেউ।

বিদ্যুৎবেগে পিছন ফিরে তাকিয়ে জানোয়ারকে দেখতে পেল রানা। লোকটার চোখের দিকে তাকাল না ও। ঘাড় ফিরিয়ে নিল ধীরে ধীরে।

তিন মিনিট পর পাশের কামরা থেকে ফিরে এসে আবার বসল ঠাকুর। সিগারেট ধরিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল রানা সিলিংয়ের দিকে। নটরাজের দিকে না চেয়েও অনুভব করছে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে লোকটা ওর মুখের দিকে।

'এই যে।' একটা দামী এনভেলাপ টেবিলের উপর রাখল ঠাকুর।

এনভেলাপ খুলে ম্যাপটা বের করল রানা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সময় নিয়ে দেখল। সারা ঘরে পিন পতন স্তব্ধতা। তিন জোড়া চোখ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে ওর মুখ। আগ্রহে খানিকটা ঝুঁকে এসেছে সামনে। মুখ তুলে ঠাকুরের দিকে চেয়ে হাসল রানা।

'বলুন!'

ঠাকুরের গলা উত্তেজনায় কাঁপছে।

'কিছু বলতে গেলে পুনরাবৃত্তি করতে হয়। আমার উত্তর আপনাদের নিরাশ করবে।'

'তবু বলুন!' উৎসুক কণ্ঠে বলল কাংকারিয়া।

'এই ম্যাপের সবটুকু নকল নয়। প্রথম অংশটুকু প্রায় ঠিকই আছে। কিন্তু এইখানে এসে…' আঙুল রাখল রানা ম্যাপের মাঝামাঝি এক জায়গায়। 'ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আপনাদের বিশ্বস্ত ব্যক্তিটি গোলমাল শুরু করেছেন। যে জায়গায় জাহাজের লোকেশন পিন-পয়েন্ট করে দেখানো হয়েছে, আসল লোকেশন সেখান থেকে অন্তত পঞ্চাশ মাইল…'

সকলের অজান্তেই পকেট থেকে রিভলভার বের করে এনেছে নটরাজ। কথা শেষ হওয়ার আগেই রানার কপাল বরাবর গুলি করল সে।

দশ

হা হা করে হেসে উঠল ঠাকুর।

প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছে নটরাজ। রিভলভারটার দিকে তাকাচ্ছে ঘনঘন। টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে ওটা।

হাসি থামিয়ে রানার উদ্দেশে বলল ঠাকুর, 'আপনি মিথ্যে কথা বলছেন, মি. রাশেদ। মিথ্যেবাদীর চরম শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তার আগে আমরা কিছু কথা আদায় করব আপনার কাছ থেকে।'

ঠাকুরের কথাগুলো কানে ঢুকছে না রানার। লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল ও। নটরাজ মেরেই ফেলেছিল ওকে। ঠাকুর যদি বিদ্যুৎবেগে হাতের ঝাপটা দিয়ে ওকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না করত তাহলে রানার কানের পাশ দিয়ে না গিয়ে কপাল ভেদ করেই বেরিয়ে যেত বুলেটটা। দ্বিতীয় গুলির আগেই

রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছে জানোয়ার ওর হাত থেকে।

নটরাজের দিকে চাইল ঠাকুর। 'মাথা গরম করা আমাদের সাজে না, নটরাজ। এই লোকটা বলছে ওর কাছে আসল ম্যাপটা আছে। সেটা আসল হোক বা নকল হোক, হাতের মুঠোয় না এনে ওকে মেরে ফেললে লাভ কি?'

দাঁতে দাঁত চেপে নটরাজ বলল, 'কিন্তু ঠাকুর, মিথ্যে কথা বলে ঠকাতে চাইছে ও তোমাকে। ওর কাছে কোন ম্যাপ নেই। থাকতে পারে না।'

'ঠকাতে চাইলেই কি ঠকব আমি?' হাসিমুখে বলল ঠাকুর। 'কেউ ঠকাতে পারবে না আমাকে। কারও সাধ্য নেই। যাই হোক, আপাতত ওকে আমি বন্দী করে রাখতে চাই। আরও কথা বের করা দরকার। আপনি কি বলেন, মি. কাংকারিয়া?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল কাংকারিয়া।

জানোয়ার হাত রাখল রানার কাঁধে। নিজের অজান্তেই রানার সর্বশরীরের পেশীগুলো প্রস্তুত হয়ে গেল।

'মি. রাশেদ, দয়া করে জানোয়ারের সাথে লড়তে যাবেন না, প্লীজ!' ঠাকুর বলল। 'বাধা দিলে অনর্থক কষ্ট পাবেন।'

টেনে দাঁড় করাল জানোয়ার রানাকে। পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল হাত দুটো।

'সব রকম প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে,' বলল ঠাকুর। 'এক হপ্তার মধ্যে কাজে নামতে যাচ্ছি আমরা। আর আজ আপনি বলছেন আমাদের ম্যাপ নকল। এ পর্যন্ত কত টাকা খরচ করেছি জানেন? একুশ লাখ! খেলা কথা নয়! কাজেই কোন নকল ম্যাপ নিয়ে অপারেশনে হাত দেব না আমি। এখন কাজ আমার একটাই। কোন্ ম্যাপটা আসল তা জানা।'

রানার দিকে চেয়ে কাংকারিয়া বলল, 'এখনও সময় আছে। সত্যি কথা স্বীকার গেলে প্রাণটা হয়তো বাঁচতে পারে।'

রানা হাসল। বলল, 'ভুলে যাচ্ছেন, আমিই জ্বলন্ত জাহাজের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। আসল ম্যাপ আপনাদের কারও কাছে নেই। যে ম্যাপটা দেখলাম তার এক নয়া পয়সাও দাম নেই।' রানা তাকাল ঠাকুরের দিকে। 'একুশ লাখ টাকা আপনি পানিতে ফেলেছেন, ঠাকুর।'

'নিজেদের মধ্যে আলোচনা করব আমরা এখন,' ঠাকুর বলল। 'মাত্র আট ঘণ্টা সময় দেব আপনাকে আমরা। ভাল মত চিন্তা ভাবনা করুনগে যান। আপনার সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ম্যাপটা আপনার কাছে আছে সেটা কোথায় রেখেছেন বলবেন কি বলবেন না।'

উত্তর দেবার আগেই পিছন থেকে ঠেলা দিল জানোয়ার। তিন ধাক্কায় চৌকাঠ পেরিয়ে পাশের কামরায় চলে এল রানা।

বেশ বড়সড় ঘর। দামী আসবাবে সুসজ্জিত। দেয়ালের গায়ে একটা বোতাম টিপে বিশাল এক স্টীলের আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল জানোয়ার। একহাতে আলমারির একটা খাঁজ ধরে টান দিতেই রিভলভিং চেয়ারের মত ঘুরে গেল আলমারিটা। সরু একটা পথ দেখা গেল। রানাকে নিয়ে অন্ধকার

গলিপথে ঢুকেই সুইচ টিপে বাতি জ্বালল জানোয়ার। আলমারিটা ঘুরিয়ে দিতেই বন্ধ হয়ে গেল গলিমুখ।

কয়েক পা এগিয়েই সিঁড়ি। জানোয়ারের ইঙ্গিতে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করল রানা। মনে মনে গুনে ফেলল সিঁড়ির ধাপ। বত্রিশটা।

নিচে নেমে আবার দেয়ালে হাত রাখল জানোয়ার। খুট্ শব্দ হলো। পনেরো পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলে উঠল। বেশ বড় একটা কামরা। ছোট বড় হরেক আকারের কাঠের বাক্স দেখে বুঝতে পারল রানা, এটা ডোপ-সিন্ডিকেটের স্টোররুম। ছোট্ট একটা কুঠুরিতে ঢোকানো হলো রানাকে। ঘরের মাঝখানে একটি মাত্র চেয়ার। ইঙ্গিত পেয়ে চেয়ারে বসল রানা। দক্ষ হাতে চেয়ারের সাথে বেঁধে ফেলল ওকে জানোয়ার। পিছিয়ে এল দু'পা। চেয়ে আছে রানার দিকে। ঘোলাটে দৃষ্টি।

গলা শুকিয়ে গেছে রানার। ঢোক গিলল

জানোয়ারের মুখে কোন ভাবই প্রকাশ পেল না। অনেকক্ষণ পর রানার চোখের উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে ডানে বাঁয়ে তাকাল সে।

জানোয়ারের দৃষ্টি অনুসরণ করে রানা একটা করাত দেখল। দেয়ালের একটা পেরেকে ঝুলানো রয়েছে। করাতের খাঁজ কাটা ব্লেডটার দিকে চোখ পড়তেই ভেতর ভেতর শিউরে উঠল সে।

ত্রিশ ইঞ্চি লম্বা করাতের গোটা ব্লেডটায় খয়েরি রঙের ছোপ। শুকনো রক্তের দাগ চিনতে ভুল হলো না ওর।

করাতটা হাতে নিয়ে রানার পাশে ফিরে এল জানোয়ার। চোখের সামনে তুলে ধরে উল্টেপাল্টে দেখল। তারপর কাঠ চেরার ভঙ্গিতে দ্রুত বার কয়েক সামনে পিছনে চালাল ওটা শূন্যে। এবার সন্তুষ্টচিত্তে একগাল হাসি মুখে ব্লেডটা ধরল রানার চাঁদির উপর।

তাকিয়ে রইল রানা। সত্যি মারবে নাকি? খুলি ভেদ করে সহজেই মগজের ভেতর সেঁধিয়ে যাবে ব্লেড···

হঠাৎ যেন ভুলটা বুঝতে পারল জানোয়ার। করাতটা আবার চোখের সামনে এনে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ব্লেডটা ধরল সে ডান হাতে। মাথার উপর তুলল হাতটা ধীরে ধীরে।

করাতের কাঠের হাতলটা নেমে এল সবেগে রানার মাথার উপর। দপ্ করে ফিউজ হয়ে গেল চোখের সামনে বাল্বটা।

জ্ঞান হারাল রানা।

চোখ মেলেই দেখল রানা জ্বলন্ত একটা নিষ্পলক চোখ চেয়ে রয়েছে ওর চোখের দিকে। বার কয়েক পলক ফেলে বুঝতে পারল ওটা চোখ নয়—বাল্ব।

দপদপ করছে মাথাটা। মনে হচ্ছে লাফাচ্ছে চাঁদি। চারদিকে তাকাল রানা। সব মনে পড়ে গেল ওর। দরজা বন্ধ করে দিয়ে গেছে জানোয়ার।

ছোট্ট কুঠুরিতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে আছে সে। শুকনো রক্তে লেপা করাতটা দরজার পাশে দাঁড় করানো।

মনে পড়ে গেল, ঠাকুর ওর প্রাণ বাঁচিয়েছে। তার একটাই উদ্দেশ্য। রানার ম্যাপটা তার চাই। নটরাজের উপর থেকে লোকটার অবিচল আস্থা আজ টলিয়ে দিয়েছে রানা। তাই রানার মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার সুযোগ দেয়নি সে নটরাজকে। ওকে দরকার ঠাকুরের। ছলে বলে কৌশলে ম্যাপটা হস্তগত করবার চেষ্টা করবে সে এখন।

ঠাকুরের ভূমিকা পরিষ্কার, কিন্তু কাংকারিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা করতে পারছে না রানা। ঠাকুরের মতই ম্যাপের আসল-নকল সম্পর্কে জানতে আগ্রহী কাংকারিয়াও। কিন্তু ডুবে যাওয়া জাহাজের একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী রাশেদ, একথা জানা সত্ত্বেও রানার প্রতি তেমন কোন আগ্রহ নেই কেন লোকটার? ও কি জানে যে রানা নকল রাশেদ?

নটরাজ লোকটাই বা কে? যতদূর সম্ভব আর কারও মাধ্যমে ও নিজেই বিক্রি করেছে দুটো নকল ম্যাপ ঠাকুর আর কাংকারিয়ার কাছে। ম্যাপের প্রথম অংশটা মিলে যাচ্ছে অনেকখানি আসল ম্যাপের সাথে। কোথায় পেল সে এই ম্যাপ?

দরজা খুলে গেল হঠাৎ। বুকের ভিতর তড়াক করে লাফ দিল হৃৎপিণ্ডটা।

জানোয়ার ঢুকছে।

চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা। দরজার পাশ থেকে চল্লিশ ইঞ্চি লম্বা ব্লেডের করাতটা তুলছে জানোয়ার।

এখুনি শুরু হবে নির্যাতন। প্রথম পর্ব কোন্ পর্যায়ে গিয়ে থামবে কে জানে। কিছু একটা করা দরকার।

কিন্তু কি করবে সে হাত-পা বাঁধা অবস্থায়? খোলা থাকলেই বা কি করতে পারত সে জানোয়ারের বিরুদ্ধে?

চোখ মেলল রানা।

হাসছে জানোয়ার ওর ভয়াবহ নিঃশব্দ হাসি।

এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে দৈত্যটা।

লোকটা বোবা নাকি? এখন পর্যন্ত একটি কথাও বলতে শোনেনি ওকে রানা।

'ঠাকুর কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা সাহস সঞ্চয় করে।

উত্তর দিল না জানোয়ার। করাত হাতে ঝুলিয়ে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখের সামনে তুলে ধরল করাতটা। খাঁজ কাটা ব্লেডটার ধার পরীক্ষা করল। আঙুল দিয়ে।

চকচক করছে জানোয়ারের নিষ্প্রভ চোখ দুটো। খুনের নেশা কি একেই বলে?

চেয়ারের সামনে এসে দাঁড়াল জানোয়ার। লোকটার গায়ের গন্ধ পাচ্ছে রানা। হাত দুটো মুক্ত থাকলে··· কিংবা পা দুটো··· চেঁচালে কোন ফল হবে? কিছু একটা করা দরকার···দ্রুত ভাবছে রানা।

করাত তুলল জানোয়ার। এগিয়ে আসছে ব্লেডটা। চেঁচিয়ে লাভ নেই বুঝতে পারল রানা। চোখ বুজল ও।

কাটছে জানোয়ার। এর নাম করাত। যেতেও কাটে আসতেও কাটে। খসর্-খসর্, খসর্-খসর্।

দড়ি কাটছে জানোয়ার। চোখ মেলল রানা। বিরাট এক হাঁফ ছাড়ল সে। নির্যাতন নয়, জেরা করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ওকে।

বাঁধন মুক্ত করে দিয়ে দরজার দিকে ইঙ্গিত করল জানোয়ার। উঠে দাঁড়াল রানা। এবার আর সিঁড়ি ভেঙে উপরে নয়, এ দরজা ও দরজা দিয়ে কয়েকটা ঘর পেরিয়ে একটা বন্ধ দরজার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল জানোয়ার। পকেট থেকে রানার পিস্তলটা বের করে এগিয়ে ধরল রানার দিকে।

অবাক হয়ে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল রানা জানোয়ারের মুখের দিকে। কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে পিস্তলটা ঝাঁকাল জানোয়ার, নিজের মাথার পিছনটা দেখাল আঙুল দিয়ে, তারপর ইঙ্গিত করল বন্ধ দরজার দিকে। সব পরিষ্কার হয়ে গেল রানার কাছে : ছেড়ে দেয়া হচ্ছে ওকে। এটা ঠাকুরের ইচ্ছেয় ঘটছে, না জানোয়ারের ব্যক্তিগত দুর্বলতা, নাকি অদৃশ্য আর কোন হাত কাজ করছে বোঝা না গেলেও ছেড়ে যে দেয়া হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পিস্তলটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখল রানা। খালি নয়, গুলি ভর্তি। বিনা দ্বিধায় খটাশ করে পিস্তলের বাঁট দিয়ে মারল সে জানোয়ারের মাথার পিছনে। বিরাট এক হুঙ্কার দিয়ে মেঝের উপর পড়ল জানোয়ার। চিৎ হয়ে শুয়ে পিটপিট করে দেখছে রানাকে। নিঃশব্দে বল্টু খুলে পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল রানা বাইরে। সামনেই গাড়ি বারান্দা।

বাড়ির সামনের দিকটা গাঢ় অন্ধকার। বৃষ্টি থেমে গেছে। আট হাত দূরে অ্যামব্যাসাডরটা দেখতে পেল রানা আবছা মত। ছায়ার মত নিঃশব্দে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়াল সে। এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে পেল না। টপ করে উঠেই স্টার্ট দিল রানা গাড়িতে। বাতি না জেলে সাঁ করে বেরিয়ে গেল খোলা গেট দিয়ে।

দুশো গজ সামনে একটা সাইড রোড। মাত্র পাঁচ গজ থাকতে সামনের রাস্তাটা আলোকিত হয়ে উঠল। স্টার্ট দেয়াই ছিল, চোখের পলকে জীপটা সাইড রোড থেকে বেরিয়ে পথরোধ করে দাঁড়াল অ্যামব্যাসাডরের।

ড্রাইভিং সীটে বসা লোকটাকে সার্জেন্ট চোপড়ার মত লাগল রানার। ভাল করে চেয়ে দেখার সময় নেই। যা আছে কপালে, ভেবে বন বন করে স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে সাইড রোডে ঢুকে পড়ল ও।

অ্যাক্সিলারেটার টিপে ধরতেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠে তীরবেগে ছুটল আবার গাড়ি। আঁকাবাঁকা রাস্তা। বার দুই মোড় নিয়েই বাতি জ্বালল রানা। গতি বাড়াল আরও। আশুতোষ মুখার্জী রোডে এসে রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল।

জীপটাকে দেখতে না পেলেও স্বস্তি পেল না রানা। ফাঁদটা যদি সার্জেন্ট চোপরার হয়ে থাকে তাহলে সহজে হাল ছাড়বে না সে।

ঠিকই। চৌরঙ্গী রোডে পৌঁছে হেডলাইট দুটো দেখতে পেল রানা। দ্রুত এগিয়ে আসছে জীপটা। দূরত্ব কমছে প্রতি মুহূর্তে।

সোজা উত্তর দিকে ছুটল রানা। গোটা কয়েক ট্যাক্সিকে ওভারটেক করে লোয়ার চিৎপুর রোড ধরে এগোতে এগোতে হঠাৎ বাঁয়ে মোড় নিয়ে ঢুকে পড়ল হ্যারিসন রোডে। তারপর স্ট্র্যান্ড রোড পেরিয়ে উঠে পড়ল হাওড়া ব্রিজে। পিছু ছাড়েনি জীপটা। সোজা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড ধরে ছুটবে, নাকি বাঁয়ে বাকল্যান্ড রোডে ঢুকে পড়বে ভাবল রানা। বাঁয়ে মোড় নেয়াই স্থির করল।

ষাট মাইল বেগে ছুটছে অ্যামব্যাসাডর। খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে জীপ।

কোথায় কি ঘটল কে জানে, একযোগে রাস্তার পাশের সবগুলো বাতি, নিওন সাইন অফ হয়ে গেল। সুযোগটা নিল রানা। চট্ করে লাইট অফ করে দিয়ে একটা সাইড রোডে ঢুকে পড়ল।

এদিকের রাস্তাঘাট অচেনা। তিনশো গজ এগিয়ে বাঁয়ে মোড় নিল সে। রাস্তার কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে আপত্তি জানাল, কেউ কেউ ধাওয়া করল রেগে গিয়ে। পাঁচশো গজ পর আবার টার্ন। এবার ডানদিকে। পুরো এলাকটা ডুবে আছে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে।

জ্বলে উঠল হেড লাইট। জীপের। চোপরার চোখে ধুলো দিতে পারেনি সে। এখন মেইন রোডে উঠে ফুল স্পীড দেয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। মেইন রোডে উঠেই তীর চিহ্ন আঁকা ছোট একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল: কসমোপলিটান ক্লাব। দপ্ করে জ্বলে উঠল একসাথে পুরো এলাকার সব নিভে যাওয়া বাতি।

দ্রুত ভাবছে রানা। জীপটাকে খসাতে পারেনি ও। সহজে পারবে বলেও মনে হয় না। মরিয়া হয়ে ধাওয়া করছে সার্জেন্ট চোপরা। হাওড়া পুলিসের সাহায্য নিলে কেমন হয়? প্রায় সাথে সাথেই দূর করে দিল রানা চিন্তাটা।

লাভ হবে না।

ক্লাবটা চোখে পড়ল হঠাৎ। নাইট-ক্লাব। ত্রিশ-চল্লিশটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লনে। সোজা গেট পেরিয়ে ব্রেক কষে গাড়ির ভিড়ে দাঁড় করাল রানা অ্যামব্যাসাডরটা।

জীপের শব্দ শোনা যাচ্ছে। হেডলাইটের আলো পড়ল গায়ে। একলাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে বারান্দায় উঠল রানা।

করিডরে কেউ নেই। হলরুমের দরজাটা খোলা। ঢুকেই থমকে দাঁড়াল রানা। বহু লোক। কেউ তাকাল না ওর দিকে। ব্যস্ত সবাই। দশ-বারো জোড়া নাচছে বাজনার তালে তালে। কয়েক জোড়া সাদা চামড়াও রয়েছে। চেয়ারগুলোর একটাও শূন্য নয়। বয়-বেয়ারা ছুটোছুটি করছে। সিগারেট, অ্যালকোহল আর বিরিয়ানীর গন্ধ। ভোজন, পান আর নাচ-গান সমান তালে চলেছে।

সেগুন কাঠের উপর নকশা করা রেলিংটা চোখে পড়ল রানার। সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। দ্রুত পায়ে এগোল রানা সেইদিকে।

সিঁড়ির মাথায় ওঠেনি তখনও রানা—গুলি হলো। সব কোলাহল থেমে গেল আচমকা। তিন সেকেন্ড সব চুপ, পাথরের মূর্তির মত জমে গেছে সবাই। তারপর একসাথে চেঁচিয়ে উঠল প্রত্যেকে।

পিছন ফিরে সার্জেন্ট চোপরা ও তার দুই সঙ্গীকে দেখতে পেল রানা। তিনজনের হাতেই রিভলভার। কিন্তু পুলিসের ইউনিফর্ম নেই, সাদা পোশাক। রানার সাথে চোখাচোখি হতেই চেঁচিয়ে উঠল চোপরা, 'হ্যান্ডস্ আপ!'

কিসের হ্যান্ডস্ আপ—দুই লাফে বাকি ধাপ ক'টা টপকে উপরে উঠে গেল রানা। গুলি হলো আবার। বুটজুতোর ছুটন্ত শব্দ কানে এল, কিন্তু দাঁড়াল না সে। করিডর ধরে ছুটল সামনের দিকে। হাতে বেরিয়ে এসেছে ওয়ালথার পি. পি. কে।

পর পর দুটো দরজার হাতল ধরে টানল রানা। ভিতর থেকে বন্ধ। তৃতীয় দরজাটা খোলা দেখল।

রুমের ভিতর অন্ধকার। দরজাটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখল রানা ভিতর থেকে বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই। সিঁড়িতে ভারী পায়ের শব্দ।

দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে পর্দা লাগানো জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে তাকাল ও। গরাদহীন জানালা। পাশে সরু একটা প্যাসেজ। জানালা টপকে প্যাসেজ ধরে ছুটল রানা। শেষ মাথায় একটা দরজা। ঠেলা দিতেই খুলে গেল। ভিতরে কেউ আছে নাকি?

করিডরে ভারী বুটের শব্দ শোনা যাচ্ছে। দড়াম দড়াম দরজা খোলার শব্দ। এগিয়ে আসছে। ঠিক এমনি সময়ে আবার নিভে গেল সব বাতি।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে দরজাটা ভিড়িয়ে দিয়ে পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালল রানা।

প্রথমেই চোখে পড়ল একটা জানালা। পর্দা সরিয়ে নিচে তাকাতেই লাইন বন্দী গাড়িগুলো দেখা গেল। ছুটোছুটি করে বেরিয়ে আসছে সবাই হলরুম থেকে। সবগুলো গাড়ি স্টার্ট নিয়ে একসাথে বেরিয়ে যেতে চাইছে গেটের বাইরে। চিৎকার, ডাকাডাকি, হৈ-চৈ, কান্না…

কান পাতল রানা। বুট জুতোর শব্দ।

লাইটারটা বন্ধ করতে গিয়েও করল না রানা। বড়সড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল একপাশে। টেবিলের নিচে একটা মেয়ের ফর্সা নগ্ন উরু দেখা যাচ্ছে।

টেবিলের উপর কাপড়-চোপড় স্তূপীকৃত হয়ে রয়েছে।

মুচকি হেসে লাইটার নিভিয়ে ফেলল রানা।

তিন মিনিটের মধ্যে কোলাহল আর গাড়ির গর্জন মিলিয়ে গেল। আবার একবার পর্দা সরিয়ে বাইরেটা দেখল রানা। বেয়ে নামার জন্য কোন পাইপ দেখতে পেল না সে আশপাশে। জীপের হেডলাইট জ্বলছে। সেই আলোয়

দেখতে পেল নিচে পায়চারি করছে সাদা পোশাক পরা এক সেপাই।

কাছেই বুট জুতোর শব্দ পেয়ে জানালার কাছ থেকে সরে এসে দরজার পাশে দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা। দ্বিগুণ বেগে হার্টবিট চলছে। দরজাটাকে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে শত্রু, না থামবে?

থামল।

দড়াম করে খুলে গেল কপাট। টর্চের উজ্জ্বল আলো বাম দিক থেকে ডান দিক সরতে সরতে মেয়েটার ফর্সা উরুর উপর থমকে গেল। এক জোড়া ভীত, বিস্ফারিত চোখ দেখতে পেল রানা।

লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল চোপরা। দড়াম করে লাথি মারল উলঙ্গ দেহে। হুমড়ি খেয়ে সঙ্গীর গায়ের উপর পড়ল মেয়েটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে।

'কাঁহা গিয়া?' ধমকে উঠল চোপরা। 'তিসরা আদমী কাঁহা?'

তিসরা আদমী ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে দুই পা। আরও এক পা এগিয়েই লাফ দিল রানা। কিন্তু রানা পৌঁছবার আগেই টর্চ হাতে পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল চোপরা।

মাথাটা একপাশে কাত করে ফেলায় রানার পিস্তলের বাঁট মাথায় না লেগে লাগল চোপরার চাপড়া চোয়ালে। থ্যাচ করে শব্দ হলো একটা। একই সাথে বামহাতে কারাতের কোপ চালিয়েছিল রানা ওর পিস্তল ধরা হাতের উপর। টর্চটা আপনিই খসে গিয়েছিল, পিস্তলটাও ছিটকে গিয়ে পড়ল মেঝেতে। দিশে হারিয়ে অন্ধের মত চতুর্দিকে ঘুসি চালাতে শুরু করল চোপরা। সরে যাওয়ার আগেই প্রচণ্ড এক ঘুসি এসে লাগল রানার নাকের উপর। হুড়মুড় করে কপাটের উপর গিয়ে আছড়ে পড়ল রানা। প্রায় সাথে সাথেই উড়ে এসে ওর উপর পড়ল সার্জেন্ট চোপরা। দমাদম ঘুসি চালাচ্ছে সমানে। পড়ে গেল রানা।

বুকের উপর থেকে লোকটাকে সরাতে গিয়ে লক্ষ করল রানা, ওর নিজের হাত থেকেও খসে গেছে পিস্তলটা।

বন্য জন্তুর মত হুটোপুটি শুরু করল ওরা অন্ধকারে।

অসুরের শক্তি চোপরার গায়ে। অনেক কষ্টে উঠে বসল রানা হাঁটু গেড়ে। ডান হাতটা ছাড়িয়ে নিয়েই ধাঁই করে কনুই চালাল পিছন দিকে। অস্ফুট গোঙানির শব্দ। একলাফে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণ শক্তিতে লাথি চালাল রানা। কোথাও বাধল না লাথিটা। সরে গেছে চোপরা। ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনমতে সামলে নিল কপাট আঁকড়ে ধরে।

এমনি সময় দপ করে বাতি জ্বলে উঠল আবার। রানা দেখল পাগলের মত মেঝে হাতড়ে রিভলভার খুঁজছে চোপরা। রানার পিস্তলের কাছাকাছি চলে গেছে লোকটা। তুলে নিচ্ছে ওটা।

ছুটে গিয়ে তলপেট বরাবর প্রচণ্ড এক লাথি মারল রানা। দাঁতে দাঁত চেপে চোখমুখ কুঁচকে ফেলল চোপরা। আরেক লাথিতে শুয়ে পড়ল।

পিস্তলটা তুলে নিয়ে এদিক ওদিক চাইল রানা। টেবিলের উপর পেটমোটা এক হুইস্কির বোতল দেখে তুলে নিল হাতে। তিন চার ঢোক ওস্ত

হ্যাগলার গলায় ঢেলে ছিপি বন্ধ করল। উঠে বসার চেষ্টা করছিল চোপরা, বোতলটা ভাঙল রানা ওর মাথায়। হাঁটুর উপর গোটা দুই কড়া লাথি মেরে নিশ্চিন্ত হলো, জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা। বেরিয়ে এসে শিকল তুলে দিল রানা দরজায়।

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রানা একটা ছায়া দেখে। ঝট করে ঘুরেই গুলি করল সে। সামনের দিকে বাঁকা হয়ে গেল সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো লোকটা। মুখটা বিকৃত মৃত্যু যন্ত্রণায়। ওর হাতে ধরা রিভলভারটা খসে গিয়ে নেমে এল কয়েক ধাপ। আবার দ্রুত নামতে শুরু করল রানা।

সন্তর্পণে হলরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা বারান্দায়। সিঁড়ির ধাপ ক'টা টপকে লনে নামার আগেই জীপটা স্টার্ট নিল। ওরটা ছাড়া আরও দুটো গাড়ি দেখল রানা। লনে নেমেই গুলি করল সে। বোমার আওয়াজ করে ফাটল জীপের পিছনের চাকা। চলন্ত জীপটা থেমে দাঁড়াবার আগেই লাফিয়ে নেমে এঁকেবেঁকে দৌড় দিল একজন সেপাই।

ওকে আর পিছু ধাওয়া না করে গাড়িতে উঠে বসে স্টার্ট দিল রানা। সাঁ করে বেরিয়ে এল খোলা গেট দিয়ে। ফিরে চলল যে পথে এসেছিল, সেই পথে।

কি চেয়েছিল সার্জেন্ট চোপরা? রানাকে ধরে নিয়ে যেতে, না হত্যা করতে? সিভিল পোশাকে ছিল কেন ওরা? ওরা কাংকারিয়ার লোক, না নটরাজের?

যাই হোক, রাশেদের পরিচয়ে কোলকাতায় টেকা এখন এক কথায় অসম্ভব। পুলিস খুন করেছে ও। যত শীঘ্রি সম্ভব পরিচয় পাল্টাতে হবে ওকে।

এগারো

হোটেলে ফেরা চলবে না। দীপালির কাছে গেলে কেমন হয়? না, সেলিনার ওখানে যাওয়া দরকার আগে। ওর নিরাপত্তার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। ম্যাপটা ওর কাছেই আছে।

আবার একবার রিয়ার ভিউ মিররে চোখ রেখে ভ্রূকুঞ্চিত করল রানা। গাড়িটা অনেক পিছনে রয়েছে ঠিক, কিন্তু অনুসরণ করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। গতি বাড়ালে গতি বাড়ায়, কমালে কমায়। দশ মিনিট যাবৎ সমান দূরত্ব বজায় রেখে পিছু পিছু আসছে গাড়িটা।

ব্রিজ পেরিয়ে শহরে ঢুকে গাড়িটাকে আর দেখতে পেল না রানা। হয়তো ঠিকই পিছন পিছন আসছে। অফ করে দিয়েছে হেডলাইট।

আলিমুদ্দীন স্ট্রীটে সেলিনার হোটেল। হোটেল মিডল্যান্ড। চারদিক ফর্সা হয়ে এল পৌঁছতে।

রিসেপশনের কেরানীটা ওকে দোতলায় উঠতে দেবে কি দেবে না ভেবে স্থির করার আগেই সিঁড়ির মাথায় উঠে করিডরে পা দিল রানা।

ছিচল্লিশ নম্বর কামরার ভিতর আলো জ্বলছে দেখে সতর্ক হয়ে গেল রানা। আবার কোন ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে নাকি কেউ? নাকি কোন বিপদ হয়েছে সেলিনার?

নক করতে সেলিনারই গলা শোনা গেল, 'কে? কাকে চান?'

'আমি রাশেদ।'

'খোদা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সেলিনা ভেতর থেকে। খালি পায়েই ছুটে এল সে দরজার কাছে। দরজা খুলে অবাক চোখে দেখল রানাকে আপাদমস্তক। 'নিষ্ঠুর! তুমি আমাকে···অমন খারাপ একটা খবর দিয়ে···' অভিমানে রুদ্ধ হয়ে আসছিল ওর কণ্ঠস্বর, কিন্তু রানার বিধ্বস্ত চেহারা দেখেই এক নিমেষে উড়ে গেল সব অভিযোগ। চট্ করে রানার হাত ধরে টেনে আনল ঘরের ভিতর। 'আরে! কী হয়েছে তোমার, রাশেদ? ঠোঁটের পাশে রক্ত কেন!'

'আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও,' দরজা লাগিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'ঘরে আলো জ্বলছিল কেন?'

'তোমার কথা ভাবছিলাম।'

বিছানার দিকে তাকাল রানা। ভাঁজ নেই চাদরে।

'ঘুমোওনি সারা রাত?'

'না।'

'ম্যাপটা ঠিক আছে?'

'আছে।'

'এই হোটেলে ওঠার সময় কেউ তোমাকে অনুসরণ করেছিল?'

'না। খুব সাবধানে এসেছি আমি। কিন্তু এ কী অবস্থা? অ্যাক্সিডেন্ট করেছ?'

'বলছি। মুখ-হাতটা ধুয়ে নিই আগে।'

বাথরুমে ঢুকে বেসিনের কল ছেড়ে ভাল করে মুখ হাত ধুয়ে কাটা জায়গাগুলোয় ডেটল লাগিয়ে ফিরে এল রানা। সেলিনাকে কতটুকু বলবে ঠিক করে নিয়েছে সে মনে মনে। বিনা দ্বিধায় বিছানায় উঠে পড়ল রানা। চিৎ হয়ে শুয়ে চাদর টেনে নিল বুক পর্যন্ত।

বিছানায় পিঠ ঠেকাতেই আরামে বুজে আসছিল রানার চোখ, জোর করে খুলে রেখে বলল, 'সব কথা তোমার না শোনাই ভাল, সেলিনা। পুলিস হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাকে···'

'খুঁজুক,' রানার কথায় বাধা দিল সেলিনা। 'আপাতত ঘণ্টা চারেকের মধ্যে তোমাকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখছি না। কাজেই নিশ্চিন্তে ঘুম দাও একটা।' দু'আঙুলে রানার দু'চোখ টিপে বন্ধ করে দিল। 'কৈফিয়ৎ দিতে হবে না জোর করে চোখ খুলে রেখে। বিশ্রাম দরকার তোমার। আমি চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি···ঘুমোও।'

'ব্যাপারটা...'

'আবার কথা বলে!' তেড়ে উঠল সেলিনা। 'একদম চুপ!'

আলতো করে হাত বুলাচ্ছে সেলিনা ওর চুলে। দু'মিনিটের মধ্যেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়ল রানা।

ঘুম ভেঙে গেল রানার এক ঘণ্টা পরই। দরজায় টোকা পড়তে চোখ মেলল সে। বালিশের নিচ থেকে বেরিয়ে এল পিস্তলধরা হাত। ঘুমের রেশমাত্র নেই ওর চোখে। পূর্ণ সজাগ, প্রস্তুত।

সেলিনা বসে আছে মাথার কাছে। ভয় পেয়েছে। থুতনি নেড়ে দিয়ে অভয় দিল ওকে রানা, দরজা খোলার ইঙ্গিত করে বিছানা ছেড়ে আলমারির পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

আবার নক্ হলো।

'কে?' জিজ্ঞেস করল সেলিনা।

'বেয়ারা।'

কী হোলে চোখ রেখে বেয়ারার ইউনিফর্ম দেখে নিয়ে দরজা খুলল সেলিনা। একটা অ্যাটাচী কেস ও একটা চাবির রিঙ বাড়িয়ে ধরল বেয়ারা, 'এক ভদ্রলোক এটা দিয়ে গেলেন এইমাত্র।'

'কত নম্বর রুমে দিতে বলেছে?' বেয়ারা ভুল করছে মনে করে বিরক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল সেলিনা।

'ছিচল্লিশ নম্বর। বলেছেন আপনার হাতে দিয়ে বলতে—এটা রশিদ সাহেবের জন্যে।'

'আমার হাতে দিতে বলেছে?' অবাক হলো সেলিনা। দ্রুত চিন্তা করছে সে।

'ভদ্রলোক আপনাকেই দিতে বলেছেন। আর কারও হাতে দিতে বারণ করেছেন।'

আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনছে রানা। কে? দ্রুত চিন্তা স্রোত বয়ে গেল ওর মাথার ভিতর। কি আছে অ্যাটাচীর ভিতর?

'ভদ্রলোক চলে গেছেন?' জিজ্ঞেস করল সেলিনা।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'গাড়ি করে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি গাড়ি?'

'নাম তো জানি না,তবে খয়েরী রঙের।'

কসমোপলিটান ক্লাবের লনে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল রানা। তার মধ্যে একটা চকলেট রঙের। এই গাড়িটাই অনুসরণ করছিল ওকে।

'ঠিক আছে,' হাত বাড়িয়ে কেসটা নিল সেলিনা।

বেয়ারা জানতে চাইল, 'কি ব্রেকফাস্ট আনব, আজ্ঞে?'

তালিকা বলল সেলিনা। লিস্ট শুনে ডিমপোচের আকার ধারণ করল বেয়ারার চোখ। এই অপূর্ব সুন্দরী মহিলার মধ্যে যে এক ক্ষুধার্ত রাক্ষুসী বাস করে, এ কথা জানা ছিল না ওর! কল্পনাও করতে পারেনি যে কোন মহিলা এত খেতে পারে। সালাম জানিয়ে চলে গেল সে।

অ্যাটাচী কেসটা কার্পেটের উপর নামিয়ে রেখে দরজা বন্ধ করে দিল সেলিনা।

এগিয়ে এসে কেসটা তুলে নিয়ে গিয়ে বিছানার ধারে বসল রানা। কি আছে ভিতরে? খোলা কি উচিত হবে? বোমা নেই তো? বেশ ভারী ঠেকছে জিনিসটা। সামান্য একটু ঝাঁকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল রানা ভিতরে কি আছে। বোঝা গেল না।

চোখ বুজে এক মিনিট ভাবল রানা। চাবির রিঙে একটা মাত্র চাবি। বিসমিল্লা বলে খুলে ফেলল।

ডালাটা তুলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল রানা। প্রায় আঁৎকে উঠল সেলিনা।

অ্যাটাচী কেস ঠাসা ইন্ডিয়ান নোট। একশো টাকা নোটের বান্ডিল। একটা নয়, অনেকগুলো। উপরে ছোট একটা চিরকুট।

কাগজের টুকরোটা তুলে নিয়ে বিছানার উপর উপুড় করল রানা অ্যাটাচী কেস। টপাটপ গুনতে শুরু করল সেলিনা। ভাঁজ খুলে চোখের সামনে মেলে ধরল রানা কাগজটা। হাতে লেখা নয়, বাংলায় টাইপ করা কয়েকটা লাইন।

"পুলিশ থেকে সাবধান!

ফোন নম্বর: ৪৬-২৯৩৫

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা!"

টাকা প্রসঙ্গে কিছুই লেখা নেই চিরকুটে। অস্ফুট কণ্ঠে সেলিনা বলল, 'দ...শ লা...খ!'

'এত টাকা কে দিল তোমাকে, রাশেদ? কেন?' নাস্তা শেষ করে পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে প্রশ্ন করল সেলিনা। 'পুলিস থেকেই বা সাবধান হতে বলছে কেন?'

'কারণ গতরাতে একজন পুলিসকে খুন করেছি আমি। আরেকজন সার্জেন্টকে জখম করেছি মারাত্মকভাবে। আমাকে হাতে পেলে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওরা।'

'খুন করেছ!' চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সেলিনা, 'পুলিস খুন করেছ! এ কি বলছ তুমি, রাশেদ!'

'রাশেদ নয়—রানা। আমার নাম মাসুদ রানা। তুমি যখন আমার সাথে এতটা জড়িয়েছ, সব কথা জানবার অধিকার আছে তোমার, সেলিনা। শোনো।'

মোটামুটি সবটা ব্যাপার সংক্ষেপে বলল রানা—রাশেদের কথা, জাহাজডুবি, ম্যাপ, আগরতলার কথা, কোলকাতায় পৌঁছেই রাশেদ ভ্রমে

জিতেন বাবুর খুন হয়ে যাওয়া, সুধীর, দীপালির সাহায্যের কথা, চোপরার, তারপর গতরাতের ঘটনার বর্ণনা। টের পেল সে, সেলিনাকে বলতে গিয়ে নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল ওর অনেক আবছা ব্যাপার। বেশ কয়েকটা দুর্বোধ্য ইঙ্গিতের সমাধান পেয়ে গেছে ও।

মুঠির উপর চিবুক রেখে চুপচাপ সব শুনল সেলিনা। রানার কথা শেষ হওয়ার পরও একই ভঙ্গিতে বসে রইল আরও আধ মিনিট। তারপর বলল, 'টাকাটা যে-ই দিক, নক্সার জন্যে দিয়েছে।'

হাসল রানা। 'বেচারার আমও গেল, ছালাও গেল।'

'হাসতে পারছ তুমি! ভয়ে আমার কলজে শুকিয়ে আসছে।'

'কিসের ভয়, সেলিনা?'

'মহা বিপদের। তোমার চারপাশে ঘনিয়ে আসছে…'

'শুধু আমার কেন, পৃথিবীর সবারই বিপদ ঘনিয়ে আসছে, সেলিনা। দুনিয়াটা ভয়ানক জায়গা। এখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে না কেউ। মরতেই হবে। কাজেই, হেসে নাও, দুদিন বই তো নয়!'

হাসল সেলিনা। সোফার হাতলে বসে এক হাতে জড়িয়ে ধরল রানার গলা।

'রানা!'

'বলো?'

'কিছু না। এমনিই ডাকছি। দেখছি কেমন লাগে।'

কাছে টানল ওকে রানা। 'কেমন লাগছে?'

হাতল থেকে গড়িয়ে এপারে চলে এল সেলিনা। বলল, 'মিষ্টি।'

টেলিফোনে পাওয়া গেল দীপালিকে বিকেল চারটে নাগাদ। গতরাতের ঘটনা সংক্ষেপে জানাল ওকে রানা। তারপর নতুন কাজের ভার দিল।

আজই রাত আটটার মধ্যে সুধীরকে খুঁজে বের করতে হবে ওর যেমন ভাবে পারে।

'তথাস্তু, গুরুদেব!' বলে ফোন ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল দীপালি, চট করে জিজ্ঞেস করল আবার, 'কিন্তু খুঁজে বের করতে পারলে আপনাকে জানাব কোথায়?'

'আমিই তোমাকে ফোন করব আবার। ঠিক আটটায়।'

এবার একটা বিশেষ ফোন নাম্বারে ডায়াল করে ছোট্ট একটা মেসেজ দিল রানা।

হাঁ হয়ে গেল সেলিনার মুখ।

সন্ধে সাড়ে সাতটা।

রিসিভার কানে তুলে ডায়াল করল রানা।

'হ্যালো?'

অপর প্রান্ত থেকে অপরিচিত গলা ভেসে এল, 'মি. রাশেদ?'

'বলছি।'

'একটু ধরুন। জাস্ট এ মোমেন্ট।'

'দশ লাখ টাকা পেয়েছেন ঠিক মত?' ঠাকুরের কণ্ঠস্বর ভেসে এল তিন সেকেন্ড পর।

'না পাওয়ার কারণ নেই,' বলল রানা। 'কিন্তু পেলাম কেন বুঝতে পারিনি।'

'শুভেচ্ছার নিদর্শন,' ঠাকুর বলল। 'ও টাকাই সব টাকা নয়। ওটা টোকেন মানি। ওতে আমি শুধু বোঝাতে চাই, আই মিন বিজনেস। অ্যান্ড অ্যাম রেডি টু পে।'

'এতে আরও একটা ব্যাপার বোঝায়। আমার কথায় বিশ্বাস এসেছে আপনার।'

'হ্যাঁ,' বলল ঠাকুর। 'আমি বুঝতে পেরেছি মস্ত ফাঁদে ফেলে ঠকানো হচ্ছিল আমাকে। এদের ব্যবস্থা আমি করব। বেঈমানীর উপযুক্ত শাস্তি পাবে এরা। কিন্তু তার আগে আসল ম্যাপটা আমার দরকার। এ ব্যাপারে আপনার সাথে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই আমি।'

রানা বলল, 'আপনি বুঝতে পারছেন যে, কাংকারিয়াও ডাবল রোল প্লে করছে?'

'সেটা আপনার মুখে সার্জেন্ট চোপরার কথা শুনেই বুঝে নিয়েছি আমি। চোপরা হচ্ছে রামরাম কাংকারিয়ার ডান হাত।'

'আপনারা তিনজন একসাথে কাজ করছিলেন, এখন সেটা তো আর সম্ভব নয়, তাই না?'

'হ্যাঁ। কথার খেলাফ হয়ে গেছে। যৌথ উদ্যম আর সম্ভব নয়।'

'কাংকারিয়ার ম্যাপটাও যদি নকল হয়, তাহলে সেও ঠকেছে বলতে হবে।'

'আমার কি বিশ্বাস জানেন, মি. রাশেদ?' ঠাকুর বলল, 'আমার বিশ্বাস নটরাজই বিক্রি করেছে দুটো ম্যাপ আমাদের দু'জনের কাছে।'

'সম্ভবত।'

'যাই হোক, আপনি এখুনি আমার এখানে চলে আসুন, মি. রাশেদ,' ঠাকুর বলল। 'অনেক কথা আছে। নিরাপত্তার কথা ভেবে এক সেকেন্ডও দ্বিধা করবেন না। আমি আপনার নিরাপত্তার পূর্ণ গ্যারান্টি দিচ্ছি।'

'ঠিক আছে, আসছি আমি।'

'এখুনি রওনা হচ্ছেন? মিডল্যান্ড হোটেল থেকেই বলছেন?'

'হ্যাঁ। দশ মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে যাব।'

'ধন্যবাদ।' রিসিভার নামিয়ে রাখল ঠাকুর।

ঠাকুর বা রানা কেউ জানল না ঠাকুরের বাড়ির কাছেই একটা টেলিফোন পোল থেকে একজন লোক ওদের কথাবার্তা টেপ করে নিয়েছে।

গেটের ভিতরে না ঢুকেই রাস্তার অপর পাশে গাড়িটা রেখে নেমে পড়ল রানা। রাস্তা পেরোবার সময় গেটের কাছে কাউকে দেখতে না পেয়ে কেমন যেন খটকা লাগল একটু। এক সেকেন্ডের জন্যে থমকে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত পা বাড়াল সামনে।

খোলা গেট দিয়ে ঢুকে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত এসেও কাউকে দেখতে পেল না রানা। ভাল লাগছে না ব্যাপারটা। ঠাকুর জানে ও আসছে, অথচ কারও দেখা নেই, সাড়া নেই কেন?

ঘাড় ফিরিয়ে বাগানের দিকে তাকাল রানা। অন্ধকার। পিস্তলটা বেরিয়ে এল ওর হাতে।

ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজা। হলরুমে ঢুকেই বুঝতে পারল রানা ঝড় বয়ে গেছে প্রচণ্ড একটা। টেবিল চেয়ার সব উল্টানো, ভাঙাচোরা।

রক্তের দাগও দেখা গেল।

কেউ নেই।

সিঁড়ি বেয়ে দুই তৃতীয়াংশ উঠেই হঠাৎ ঝট করে পিছন ফিরে তাকাল রানা।

একটা ভাঙা চেয়ার নড়ছে। মোটা পিলারের গাঢ় ছায়া পড়েছে বলে দেখা যাচ্ছে না কাউকে। চেয়ে রইল রানা, 'কে ওখানে!'

জবাব দিল না কেউ। বিড়াল-টিড়াল নাকি? হঠাৎ প্রকাণ্ড মাথাটা দেখল রানা। টেবিলের নিচ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছে।

বহু কষ্টে কার্পেটের উপর বুক ঘষে ঘষে আলোর দিকে সরে এল জানোয়ার। চেয়ে আছে রানার দিকে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। পারছে না।

লাল শার্টটা ফুটো হয়ে গেছে চার-পাঁচ জায়গায়। ভেজা।

টলছে জানোয়ার। উঠে দাঁড়িয়েছে কিন্তু পা বাড়াতে পারছে না। রানার দিকে অসহায়, করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে লোকটা।

লাফ দিয়ে তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ টপকে নামতে শুরু করল রানা। কিন্তু পৌঁছুতে পারল না ও।

পড়ে গেল জানোয়ার। বার দুই খিঁচুনি দিয়ে স্থির হয়ে গেল।

গালের কষা বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে এখনও কার্পেটের উপর।

ঘাড়ের কাছে শার্টের কলার ভিজে গেছে রানার। ঠাণ্ডা লাগছে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল সে দ্রুত পায়ে। করিডরের দু'পাশের সবগুলো দরজা খোলা দেখল ও।

কোন ঘরে কাউকে দেখতে পেল না।

ঠাকুরের অফিসরুমের সামনে এসে দাঁড়াল রানা, 'ঠাকুর?'

জবাব এল না। ঠেলা দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল সে।

মেঝের উপর দেয়াল ঘেঁষে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে ঠাকুরের লাশ। হাতের আঙুলগুলো আঁকড়ে ধরে রেখেছে মেঝের কার্পেট। কপালে একটা ফুটো।

মগজ দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট পিছন থেকে।

ঝুঁকে পড়ে ঠাকুরের হাত স্পর্শ করল রানা। এখনও গরম।

রানা পালাও! মনের ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল। নিজের অজ্ঞান্তেই ঘাড় ফিরিয়ে দরজার দিকে তাকাল ও।

দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সার্জেন্ট চোপরা।

'খবরদার! ডোন্ট মুভ!'

নড়ল না রানা। পিছন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'ঘুরে দাঁড়াও। হুঁশিয়ার! হাত দুটো যেন এক ইঞ্চি না নড়ে।'

রানা ঘুরে দাঁড়াতে ঘরের ভিতর ঢুকল সার্জেন্ট। রিভলভারটা রানার বুক লক্ষ্য করে ধরে রেখেছে। ওয়াল-ফোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে, 'কি রকম শাস্তি চাও?'

চুপ করে রইল রানা।

'হাজতে যেতে আপত্তি নেই তো?' সার্জেন্ট হাসছে, 'পুলিস হেডকোয়ার্টারে নিয়ে গিয়ে আগা-পাছ-তলা ফাটাব আগে। বাপের নাম ভুলিয়ে ছাড়ব। হাজতে পচাব দুই বছর। তারপর মৃত্যুদণ্ড।'

'মৃত্যুদণ্ড কেন?'

'শালা আবার ন্যাকামি করছে দেখো কেমন! আরে বানচোত, পুলিস খুন করা চাট্টিখানি কথা? আর এই জোড়া খুন?'

'ঠাকুর আর জানোয়ারকে আমি খুন করিনি।'

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠল সার্জেন্ট চোপরা।

'গাঁড় চালাকি করার জায়গা পাওনি! শালা কুত্তার বাচ্চা!' দাঁত মুখ ভেঙচে খেঁকিয়ে উঠল সার্জেন্ট। 'কে শুনবে তোর কথা? ভগবানও তোর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, রামরাম কাংকারিয়া যদি চায়।'

রানার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ওয়াল-ফোনের রিসিভার তুলে নিল সার্জেন্ট। অভ্যস্ত হাতে ডায়াল করে অপেক্ষা করল কয়েক সেকেন্ড, তারপর বলল, 'পুলিস হেডকোয়ার্টারের কানেকশান দিন। কুইক!'

দেয়ালের গায়ের ইলেকট্রিক প্লাগে রানার জুতোর পিছনটা ঠেকল। প্লাগের উপর আলগোছে জুতোটা তুলে ফেলল সে সার্জেন্টের চোখের উপর চোখ রেখে।

'দিস ইজ সার্জেন্ট চোপরা!' ঘর ফাটানো চিৎকার করল সার্জেন্ট। 'গেট এ পেট্রল কার আউট টু 249/59, ল্যান্সডাউন রোড ফার্স্ট। ইনফর্ম এস. পি. কাংকারিয়া দ্যাট আই হ্যাভ অ্যারেস্টেড রাশেদুজ্জামান হু জাস্ট শট্ মি. ঠাকুর অ্যান্ড হিজ সারভেন্ট। আই কট হিম রেড হ্যান্ডেড।'

শরীরের সবটা ভার প্লাগের উপর চাপিয়ে দিল রানা। দেয়াল থেকে খসে নেমে এল সেটা। মড়মড় শব্দে ভাঙল জুতোর চাপে। চমকে চাইল চোপরা রানার পায়ের দিকে, কিন্তু শব্দটা কিসের বুঝে ওঠার আগেই জুতোর গোড়ালি দিয়ে টোকা দিল রানা ভাঙা প্লাগের গায়ে। ফাঁৎ করে নীলচে আগুন জ্বলে উঠল ওর পায়ের কাছে। পরমুহূর্তে দপ্ করে নিভে গেল দোতলার সব

বাতি।

ঝপ করে বসে পড়ল রানা চার হাত পায়ে ভর দিয়ে। সাথে সাথেই গুলি বেরোল সার্জেন্টের রিভলভার থেকে। ঝনঝন করে কেঁপে উঠল জানালার কাঁচ প্রচণ্ড শব্দে। দেয়াল থেকে প্লাস্টার খসে পড়ল রানার কাঁধে, মাথায়।

করিডরের আলোও নিভে গেছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে খানিকটা সরে গেল রানা। দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু সামান্য খশখশ শব্দ শুনে অন্ধের মত গুলি করল চোপরা। রানার চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি কেটে দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট।

একলাফে ডিভানের ওপাশে চলে গেল রানা। আবার গুলি করল চোপরা। এগিয়ে এসেছে কয়েক পা। আগুনের ঝলক দেখেই ওর মাথাটা কোথায় হতে পারে আন্দাজ করে নিয়ে প্রচণ্ড এক নক-আউট পাঞ্চ কষাল রানা। জুৎসই জায়গাতেই পড়ল ঘুসিটা—কানের উপর। ধুপধাপ এলোমেলো পা ফেলে কয়েক হাত তফাতে চলে গেল চোপরা ঘুসি খেয়ে। ঝপ করে চার-হাত পায়ে বসে পড়ল রানা আবার। আবার গুলি হলো। ঠুস করে জানালার কাঁচ ভেদ করে বেরিয়ে গেল বুলেট।

হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল রানা খানিকটা। হাঁপাচ্ছে। রানা যেন দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে না পারে সেজন্যে ওই দিকে এগোচ্ছে চোপরা। পা টিপে জানালার দিকে এগোল রানা। হাত দুটো বাড়িয়ে সামনে কোন বাধা আছে কিনা দেখতে দেখতে এগোচ্ছে সাবধানে।

দূর থেকে সাইরেনের শব্দ শুনে বুকের ভিতর জোরে এক লাফ দিল রানার হৃৎপিণ্ড। এগিয়ে আসছে শব্দটা। দ্রুত।

হাতে বাধেনি, কিন্তু খটাশ করে হাঁটুতে ঠোকর খেল রানা নিচু একটা টেবিলের কোনায়। টেবিলটা উল্টে যেতেই দিশেহারার মত বাঁ দিকে লাফ দিল সে। হুমড়ি খেয়ে একটা সোফার উপর পড়ল, সোফা উল্টে হুড়মুড়-ধড়াস করে কার্পেটে।

শব্দ আন্দাজ করে গুলি-করল চোপরা, বিকট এক আর্তনাদ করে উঠল রানা। চিৎকার শুনে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে এল চোপরা। মেশিনগানের গুলির মত অনর্গল গালি বেরোচ্ছে মুখ থেকে। রানা সামলে নিয়ে সরে যাওয়ার আগেই এসে গেল।

বাম হাতে রানার কোটের আস্তিন ধরে ফেলল চোপরা। এক ঝটকায় সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে একপাশে সরেই ঘুসি চালাল রানা। ফসকে গেল ঘুসি—চোয়াল ঘেঁষে বেরিয়ে গেল চোপরার কান ডলা দিয়ে। রানার বিকট চিৎকার যে আহত হওয়ার অভিনয় সেটা বুঝতে পেরে ঘাবড়ে গিয়ে গুলি করল আবার চোপরা। লাফ দিয়ে সরে গেল। গুলিটা এত কাছে থেকে হলো যে কানে তালা লেগে গেল রানার। আগুনের হল্কা অনুভব করল গালে। ভয় পেয়ে লাফ দিল পিছন দিকে। গুলি করেই সরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল সার্জেন্ট চোপরা, একটা ইজিচেয়ারের সাথে বেধে গিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়ল কার্পেটের উপর। কেঁপে উঠল সারাটা ঘর।

একছুটে জানালার পাশে চলে এল রানা। টান দিয়ে ফাঁক করল ভারী পর্দা। একরাশ চাঁদের আলো ঝাঁপিয়ে এসে ঢুকল ঘরে। বাইরের দিকে চেয়ে দমে গেল রানা।

কলজে-কাঁপানো সাইরেন বাজিয়ে এগিয়ে আসছে পুলিসের গাড়ি। স্পটলাইট জ্বলছে গাড়ির মাথায়। গেট দিয়ে ঢুকছে এখন। আর সময় নেই। এক লাথিতে জানালার মস্ত কাঁচটা খসিয়ে দিল রানা। পুরু কাঁচ লাথিতে ভাঙল না, নিচে পড়ে ভাঙল ঝনঝন শব্দে।

সাঁ করে এসে গাড়ি বারান্দার কাছেই রাস্তার উপর কয়েক ফুট স্কিড করে দাঁড়াল পুলিসের গাড়ি। ঝট্ করে চারটে দরজা খুলে বেরিয়ে এল চারজন ইউনিফর্ম পরা সশস্ত্র সেপাই, গাড়ির দরজা খোলা রেখেই দু'জন দৌড় দিল সদর দরজার দিকে, বাকি দু'জন ছড়িয়ে গেল দু'দিকের বাগানে।

চোপরার গর্জন শুনতে পেল রানা, ইজিচেয়ারের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রানার ইচ্ছে ছিল লাফ দিয়ে নেমে যাবে বাগানে, কিন্তু এখন আর সেটা সম্ভব নয়, ধরা পড়ে যাবে—কাজেই পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সে পর্দার আড়ালে। আছড়ে পাছড়ে জানালার ধারে এসে দাঁড়াল চোপরা। মাথাটা বাইরে বের করে দেখছে নিচটা। ছয় ইঞ্চি দূরে দাঁড়িয়ে হৃৎপিণ্ডের ধুপধাপ আওয়াজ কন্ট্রোল করবার চেষ্টা করছে রানা। চোপরার গালের আফটার-শেভ লোশনের গন্ধ পাচ্ছে সে পরিষ্কার।

কর্কশ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল চোপরা, 'জানালা দিয়ে নেমেছে! বেশি দূর যেতে পারেনি!'

কথাটা বলেই জানালা টপকে ওপাশে চলে গেল চোপরা। তারপর লাফ দিয়ে নেমে গেল নিচে। হাঁপ ছাড়ল রানা।

'এদিকে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, স্যার!' নিচে থেকে একজন সেপাইয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

গালাগালি দিয়ে উঠল চোপরা, তারপর কি বলল শোনার জন্য দাঁড়াল না আর রানা। অন্ধকার হাতড়ে কোন রকম শব্দ না করে চলে এল পাশের ঘরে যাওয়ার দরজার কাছে। লাইটার জ্বেলে স্টীলের আলমারির পাশে দেয়ালের গায়ে সেই বোতামটা খুঁজে বের করল সে। সেটা টিপে দিয়ে আলমারির খাঁজটা ধরে টান মারল প্রাণপণ শক্তিতে। চুল পরিমাণও নড়ল না আলমারি। রানা বুঝতে পারল হাজার টানাটানি করলেও নড়াতে পারবে না ও এই আলমারি। কারেন্ট নেই, কাজেই খামোকা জোর খাটিয়ে কোন লাভ হবে না।

কিন্তু তাহলে বেরোবে কি করে ও এখান থেকে?

আরও সাইরেনের শব্দ শুনতে পেল রানা। আরও পুলিস আসছে। এক্ষুণি কিছু করতে না পারলে ফাঁদে আটকে যাবে সে, কোন উপায় থাকবে না বেরোবার।

করিডর ধরে নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল রানা।

'উরি সব্বোনাশ। মানুষ না দেও ইটা!' বিস্ময় প্রকাশ করল এক

সেপাই।

সাবধানে উঁকি দিল রানা। জানোয়ারের উপর টর্চের আলো ধরে আছে একজন। দুইজোড়া বুট দেখা যাচ্ছে। এমনি সময় দড়াম করে দু'পাট খুলে গেল দরজা। চমকে পিছন ফিরল দু'জনই। চারজন লোক ঢুকল হলরুমে। একজন সেপাই, দু'জন ইন্সপেক্টর, আর সবার পিছনে রামরাম কাংকারিয়া।

জানোয়ারকে একনজর দেখে নিয়েই হলরুমের চারপাশে টর্চ ফেলে অবস্থাটা বুঝে নিল কাংকারিয়া। তারপর বলল, 'সবাই এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে ফিউযের তার লাগাও একজন। চোপরা গেল কোথায়?'

'এই যে, স্যার।' ঘরে ঢুকল গলদঘর্ম চোপরা।

'জানালা দিয়েই নামতে দেখেছ ওকে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ, স্যার। নিজের চোখে দেখেছি। বেশি দূর যেতে হবে না বাছাধনকে। চারদিক ঘিরে ফেলা হয়েছে।'

'পালাল কি করে?' বিরক্ত দৃষ্টি রাখল কাংকারিয়া চোপরার মুখে।

মাথা নিচু করে মেঝেতে জুতো ঘষল চোপরা।

'আজ্ঞে, স্যার, একটা প্লাগ জুতো দিয়ে মাড়িয়ে সব বাতি ফিউয করে…'

'তা তুমি সময় মত এখানে পৌঁছে গেলে কি করে?'

'নটরাজ বাবু ফোন করে জানালেন এখানে পাওয়া যাবে হারামিটাকে। ফোন পেয়েই…'

'খুব এফিশিয়েন্সি দেখিয়েছ! একা চালিয়াতি করতে কে বলেছিল তোমাকে? লোকটা ভয়ঙ্কর, একথা কতবার করে বলেছি তোমাকে? সাথে আরও লোক নিতে কি অসুবিধে ছিল?'

'ধরা পড়বেই, স্যার,' একগুঁয়ে কণ্ঠে বলল চোপরা। 'পালাতে পারবে না।'

'না পারলেই তোমার জন্যে মঙ্গল!' বলল কাংকারিয়া। 'আমি চললাম। লাশ তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করো। আর ওকে ধরতে পারলে খবর দেবে আমাকে। মনে রাখবে—জ্যান্ত চাই ওকে।' বেরিয়ে চলে যাচ্ছিল, থেমে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর দু'জনকে আদেশ করল, 'তোমরা দু'জন দোতলাটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো আর একবার।' সেপাইদের দিকে চাইল, 'তোমরা দেখো নিচ তলাটা।'

'ইয়েস, স্যার!'

বেরিয়ে গেল কাংকারিয়া। ওর পিছু পিছু গেল চোপরা।

'কুত্তার বাচ্চা!' চাপা গলায় বলল একজন ইন্সপেক্টর।

হেসে উঠল দ্বিতীয় জন। 'কোন্ জন?'

'দুটোই। বাপের ঠিক নেই শালাদের। মানিকজোড় মিলেছে ভাল।'

'হয়েছে, হয়েছে,' বলল দ্বিতীয় জন। পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে। 'আমরা দুই মানিকজোড় এবার ওপরটা খুঁজে আসি, চ'।'

সিঁড়ির মাথা থেকে সরে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল রানা। ঠিক এমনি সময়ে দপ করে জ্বলে উঠল সব বাতি, একসাথে।

রানার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল সিঁড়ির নিচে দাঁড়ানো ইন্সপেক্টরের।

বিস্ফারিত চোখে কয়েক সেকেন্ড চেয়ে রইল পরস্পর পরস্পরের চোখের দিকে। সংবিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুতপায়ে উপরে উঠতে শুরু করল ইন্সপেক্টর। তাড়াহুড়োয় রিভলভার বের করতেও ভুলে গেছে।

লম্বা করিডর ধরে খিচে দৌড় দিল রানা।

বারো

কাউন্টারে পরিচিত ক্লার্ককে দেখে খুশি হলো রানা। বেশ আলাপী লোকটা। আজই বিকেলে পরিচয় হয়েছে।

'স্যার, আপনি!'

হাঁ হয়ে গেল রিসেপশনিস্ট জলজ্যান্ত রানাকে হোটেলে ঢুকতে দেখে। ওকে দেখে আর গলার স্বর শুনে জান উড়ে গেল রানার।

'কি হয়েছে! খারাপ কিছু?'

'আপনার অ্যাক্সিডেন্টের সংবাদ শুনেই তো...'

'আমার অ্যাক্সিডেন্ট। কী বলছেন আপনি!' বিপদের আশঙ্কায় কালো হয়ে গেল রানার মুখটা। 'সেলিনাকে পাচ্ছি না কেন ফোনে?'

'উনি তো বেরিয়ে গেলেন...দু'জন ভদ্রলোক...সাথে মোটা এক মহিলা...'

'কতক্ষণ আগে?'

'আধঘন্টা খানেক হবে। ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন অ্যাটাচী কেস হাতে করে। কেন, আপনার কোন দুর্ঘটনা হয়নি?'

'না। কিডন্যাপ করা হয়েছে ওকে। কোন্ দিকে গেছে বলতে পারবেন?'

চোখ কপালে উঠল রিসেপশনিস্টের। মাথা নাড়ল।

'সেটা তো লক্ষ্য করিনি। এ তো ভয়ানক ব্যাপার! পুলিসে খবর...'

'কচু করবে পুলিস!' বলল রানা। আসলে নিজের উপরেই রেগে গেছে সে। আগেই সাবধান করা উচিত ছিল সেলিনাকে। ঘড়িটা একবার দেখে নিয়ে হাত বাড়াল সামনে। 'ওসব ঝামেলার মধ্যে যাবেন না। দিন, ছিচল্লিশ নাম্বারের চাবিটা দিন তাড়াতাড়ি।'

কামরাটায় একবার নজর বুলিয়েই বুঝতে পারল রানা, দুঃসংবাদ শুনে তাড়াহুড়ো করে এক কাপড়ে বেরিয়ে গেছে সেলিনা।

কাজটা কার? সার্জেন্ট চোপরার? কাংকারিয়ার? নাকি নটরাজের?

নটরাজের কথা মনে হতেই স্মরণ হলো রানার, এক ঘন্টা আগে ঠাকুরের বাড়িতে সার্জেন্ট চোপরা কাংকারিয়াকে বলেছিল নটরাজের ফোন পেয়ে সে গিয়ে হাজির হয়েছিল ওখানে ঠিক সময় মত। নটরাজ জানল কি করে ঠাকুরের সাথে দেখা করতে যাচ্ছে রানা? টেলিফোন করবার সময় ঠাকুরের সামনে সে

যে ছিল না সেটা ধরে নেয়া যায়। তাহলে? টেলিফোন ট্যাপ করবার ব্যবস্থা করেছিল সে?

নিশ্চয়ই তাই। টেলিফোনে এই হোটেলের উল্লেখ করেছিল রানা ঠাকুরের কি একটা প্রশ্নের উত্তরে। টেলিফোনের কথোপকথন থেকেই এই হোটেলের ঠিকানা পেয়েছে নটরাজ। ধরে নিয়ে গেছে সেলিনাকে—নক্সা না দিলে খুন করবার হুমকি দেবে।

অথচ নক্সাটা রানার কাছে নেই। কোথায় আছে তাও জানা নেই ওর। সেলিনা বলেছিল এমন এক জায়গায় রেখেছে যেখান থেকে খুঁজে বের করবার সাধ্য নেই কারও।

তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে খুঁজতে শুরু করল রানা। বিশ মিনিট তন্ন তন্ন করে খুঁজে হতাশ হয়ে ধপাস করে বসল বিছানার ধারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার একবার ডায়াল করল দীপালির নাম্বারে। রিং হচ্ছে, কিন্তু ধরছে না কেউ। বিশবার রিং হওয়ার পরও যখন কেউ রিসিভার তুলল না তখন কানেকশন কেটে দিয়ে আবার গোড়া থেকে ভাবতে বসল রানা।

ঠাকুরের কোকেনের গুদামে বসে আধঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেও না সেলিনা, না দীপালি—কাউকে পায়নি সে ফোনে। ইন্সপেক্টরের তাড়া খেয়ে একছুটে স্টীলের আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে, ফিউয ঠিক হয়ে যাওয়ায় বোতাম টিপে আলমারির খাঁজ ধরে টান দিতেই ঘুরে গিয়ে পথ করে দিয়েছিল সেটা ভিতরে ঢোকার। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে অপেক্ষা করেছে সে আধঘণ্টা, টেলিফোনে খবর নেয়ার চেষ্টা করেছে সেলিনা ও দীপালির। তারপর অসহিষ্ণু হয়ে বেরিয়ে এসেছে একটা পিছন-দরজা খুঁজে পেয়ে।

এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পেল না রানা। ঠাকুর ও জানোয়ারকে খুন করে কাংকারিয়ার লোককে লেলিয়ে দিয়েছিল নটরাজ রানার পিছনে। নটরাজ নিশ্চয়ই জানে, রানা একবার কাংকারিয়ার মুঠোর মধ্যে চলে গেলে ওর পক্ষে ম্যাপটা হাত করা আর সম্ভব নয়। তার মানে এখনও সে বিশ্বাস করে না যে রানার কাছে আসল ম্যাপ আছে। এত নিশ্চিত হওয়ার কারণ কি? কিন্তু ম্যাপ আদায়ের চেষ্টা ছাড়া সেলিনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ারই বা কারণ কি? নটরাজের প্ল্যান অনুযায়ী রানার এতক্ষণে হাজতে থাকার কথা। কাজেই দশ লাখ টাকা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা বোঝা যায়, কিন্তু সেলিনাকে কেন কিডন্যাপ করা হলো বোঝা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই আরও কোন একটা ব্যাপার আছে যেটা রানা দেখতে পাচ্ছে না।

সেক্ষেত্রে এখানে অপেক্ষা করা কি ঠিক হচ্ছে?

হঠাৎ কানের পাশে টেলিফোন বেজে উঠতে চমকে উঠল রানা। খপ করে রিসিভার তুলে নিয়ে কানে ঠেকাল। দীপালির আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর।

'রাশেদ সাহেব!' হাঁপাচ্ছে দীপালি। 'কে ফোন ধরেছেন···রাশেদ সাহেব? আমি দীপালি বলছি···ধরে নিয়ে এসেছে আমাদের···'

'কোত্থেকে বলছ তুমি, দীপালি?' রানার কণ্ঠে চাপা উত্তেজনা। 'কি

হয়েছে?'

'সেলিনা...' খট্ করে একটা শব্দ হলো লাইনের কোথাও, 'শুনতে পাচ্ছেন?'

'পাচ্ছি, বলো।'

'সেলিনাকেও ধরে এনেছে খানিক আগে। ওর কাছেই আপনার নম্বর পেলাম। হাতের বাঁধন খুলে পাশের ঘর থেকে ফোন করছি। শীঘ্রি একটা কিছু ব্যবস্থা...'

'ঠিকানাটা বলো...'

'পিপলস গ্যালারি...' ভালভাবে কথা বলতে পারছে না দীপালি। আতঙ্কে গলা কাঁপছে। 'একা আসবেন না, খবরদার! পুলিস...পুলিস নিয়ে...মাগো...' কথার মাঝখানেই থেমে গেল দীপালি। পরমুহূর্তেই শোনা গেল গলা ফাটানো তীক্ষ্ণ চিৎকার। চেঁচাচ্ছে দীপালি।

রানার কানে শব্দ ঢুকল একটা—ঠক্! রিসিভার পড়ে গেছে দীপালির হাত থেকে, সেই শব্দ। তারপর কেটে গেল কানেকশন।

চোখ বুজে একমিনিট ভাবল রানা। একটা বিশেষ নাম্বারে ছোট্ট একটা মেসেজ দিয়ে বেরিয়ে এল সেলিনার কামরা থেকে। দ্রুতপায়ে নামছে সে। চোখেমুখে আত্মপ্রত্যয় ও দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ। আর কোন দ্বিধা নেই ওর মনে।

রাত সাড়ে ন'টা। বুলেটের বেগে ছুটে চলেছে একটা কালো অ্যামব্যাসাডর। ড্রাইভিং সীটে রানা। একমাত্র আরোহী। ঠোঁটের কোণে জ্বলন্ত সিগারেট। সতর্ক দৃষ্টি রাস্তায়।

আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে টার্ন নেবার সময় আর্তনাদ করে উঠল চাকাগুলো। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল রিকশাটা। গতি একটু কমাল রানা। কোন রকম ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না এখন।

মেয়ো রোডে পড়ে আরও একটু কমাল গতি।

আর মাইলখানেক মাত্র।

পিপলস গ্যালারির গেট পেরিয়ে সাইড রোডে ঢুকল রানা। অফ করে দিল লাইট। বাড়ির চৌহদ্দি সত্যিই প্রকাণ্ড। লম্বা। একেবারে গঙ্গার কিনারা অবধি।

ষাট গজ মত এগিয়ে থামল অ্যামব্যাসাডর। পাঁচিলের গা ঘেঁষে।

স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে নেমে এল রানা। হাতে বেরিয়ে এসেছে ওর প্রিয় ওয়ালথার পি. পি. কে। এদিক ওদিক ভাল করে দেখে নিয়ে উঠে পড়ল রানা গাড়ির ছাদে। দাঁতে কামড়ে ধরল পিস্তলটা। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে দু'হাতে ধরল উঁচু পাঁচিলের মাথা। কাঁচের টুকরো বা পেরেক বসানো নেই ভাগ্যিস! দেয়ালের গায়ে পা ঠেকিয়ে পাঁচিলের উপর চড়ে বসে চারদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাল রানা।

দেখার কিছু নেই। গোটা বাগান ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য। বাড়ির কোথাও

একবিন্দু আলোর আভাস নেই। সরে পড়ল নাকি!

লাফ দিয়ে নামল রানা বাগানে। প্রায় নিঃশব্দে। তাল সামলে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে কান পাতল। কোথাও কোন শব্দ নেই। তবু কেন যেন অস্বস্তি বোধ করল সে। আরও এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

পা বাড়াতে গিয়ে মনে হলো শুকনো পাতা মাড়াল কেউ কাছাকাছিই কোথাও। ভুল শুনল নাকি! পিস্তলটা সামান্য একটু বাঁয়ে ফিরল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল সে দু'মিনিট। ঝিঁঝির ডাক, মাঝে মাঝে গাছের ডালে কোন পাখির পাখা ঝাপটানো, বাদুড়ের সাঁই সাঁই বাতাস কেটে ওড়া—এ ছাড়া আর কোন শব্দ পেল না রানা। সাবধানে পা বাড়াল। এক গাছের আড়াল থেকে সরে আরেক গাছের আড়ালে। রানা জানে, কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই লুকিয়ে আছে কেউ। ওর প্রথম কাজ প্রহরীদের খুঁজে বের করা। ওদের অবস্থান জেনে নিয়ে তারপর ঠিক করবে কিভাবে ঢোকা যায় বাড়ির ভিতর।

দশ মিনিটের মধ্যে খুঁজে বের করল রানা তিনজনকে। ল্যাঙোট, হাফপ্যান্ট আর ট্রাউজার সতর্ক পাহারায় আছে বাড়িটার তিনদিকে। ভেবে চিন্তে ল্যাঙোটকেই বেছে নিল রানা। নিঃশব্দে কাজটা সারতে পারলে বাকি দু'জনের অজান্তেই ঢুকতে পারবে সে বাড়ির ভিতর।

একটা ঝোপের আড়ালে বসে আপন মনে গোঁফে তা দিচ্ছে ল্যাঙোট। টেরও পেল না কখন কিভাবে ওর এক ফুট পিছনে এসে হাজির হয়েছে সাক্ষাৎ যম। ঘাড়ের উপর পিস্তলের ঠাণ্ডা নলের স্পর্শে আঁৎকে উঠল। চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমনি সময় চাপা গম্ভীর কণ্ঠস্বর কানে গেল।

'টু শব্দ করলে মারা পড়বে! বাঁচতে চাইলে চুপচাপ উঠে দাঁড়াও।'

বাঁচতে চাইল পালোয়ান। কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে ওর অপরিপুষ্ট পায়ে। পিছন থেকে ঠেলা খেয়ে কাঁপতে কাঁপতে এগোল সামনে।

অফিস কামরার মধ্যে দিয়ে গ্যালারিতে এসে দাঁড়াল রানা। মৃদু আলো জ্বলছে। জানালার পর্দা টানা থাকায় বাইরে থেকে মনে হয় কোথাও কোন বাতি নেই।

'ম্যানেজার কোথায়?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বেরিয়ে গেছে আধঘণ্টা আগে।'

'সেলিনা কোথায়?'

'চিনি না।'

'যে মেয়েটাকে ধরে আনা হয়েছে। কোথায় সে?' পিস্তল দিয়ে খোঁচা দিল রানা ওর ঘাড়ে, সেই সাথে মৃদু একটা লাথি দিল পায়ের গোড়ালিতে।

'জানি না, বাবু!' ককিয়ে উঠল ল্যাঙোট। 'ম্যানেজারের ঘরে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর কি হয়েছে জানি না।'

'আগে বাড়ো।'

ম্যানেজারের কামরায় কেউ নেই। দুই দেয়ালে দুটো দরজা। বন্ধ।

ভয় দেখিয়েও কোন লাভ হলো না। কিছুই বের করা গেল না ল্যাঙোটের

পেট থেকে। আচমকা শরীরের তিনটে দুর্বল নার্ভ সেন্টারে আঘাত করে ধরাশায়ী করল রানা ল্যাঙোটকে। মেঝেতে আছড়ে পড়ার আগেই জ্ঞান হারিয়েছে পালোয়ান।

এবার কয়েক হ্যাঁচকা টানে ওর একমাত্র বস্ত্র ল্যাঙোটটা খুলে নিয়ে হাত-পা বাঁধল শক্ত করে। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বিশ মিনিট পর আবার এসে ঢুকল রানা ম্যানেজারের কামরায়। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে পালোয়ান। ন্যাংটো ভাঁড় নাক ডাকছে। গোটা বাড়িটায় মোট তেইশটা কামরা। সেলিনা কোথাও নেই।

সরিয়ে ফেলা হয়েছে ওকে? পালিয়েছে সবাই?

কিন্তু পালাল কখন? সবাই পালালে বাগানে ওরা তিনজন ছিল কেন? রানা আসার পর অন্তত পালায়নি। গাড়ির শব্দ হত তাহলে।

কোথাও দেখতে বাকি নেই তো? কোনও গোপন কুঠুরি, কোন গুপ্ত পথ··· বাড়িটার দুই প্রান্ত মিশেছে গিয়ে নদীতে। নদীপথে পালাল?

বামদিকের উইং ধরে এগোল আবার রানা। শেষ ঘরটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ভাল করে।

বেশি দেরি হলো না। খানিক পরীক্ষা করেই ফাঁপা জায়গাটা পেয়ে গেল রানা। নিচু হয়ে দেখল মেঝের ছোট্ট একটা অংশ আলগা—একটা খাঁজ ধরে টান দিলেই উঠে আসবে উপরে।

খাঁজে আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে টানল রানা উপর দিকে। যতটা জোর লাগবে মনে করেছিল, তার দশভাগের একভাগ জোর খাটাতেই উঠে এল দেড় ইঞ্চি পুরু ঢাকনিটা। দু'ফুট লম্বা, দু'ফুট চওড়া চতুষ্কোণ একটা গর্ত সৃষ্টি হলো মেঝেতে। ভিতরে আলো জ্বলছে—ঝকঝকে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে নিচে। নেমে পড়ল।

মাত্র কয়েকটা ধাপ। সরু একটা প্যাসেজে নামল সে। কয়েক পা এগিয়ে ডাইনে ঘুরেই আবার সিঁড়ি। গুনে গুনে সতেরো ধাপ নামল। তারপর বন্ধ দরজা।

চাবি মারা। ভাঙা ছাড়া উপায় নেই। পিস্তলটা বের করল হোলস্টার থেকে। ছুটে গিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ধাক্কা মারল দরজায় কাঁধ দিয়ে। দড়াম করে দু'পাট খুলে হাঁ হয়ে গেল দরজা। কেউ নেই ভিতরে। উঁচু সিলিং, লম্বাটে ঘর। ঘরের পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড একটা সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে নিচের দিকে। অদৃশ্য হয়ে গেছে পানিতে।

পানির দিকে তাকিয়ে রইল রানা কয়েক সেকেন্ড। বুঝতে অসুবিধে হলো না এ পানি গঙ্গার পানি। গঙ্গার সাথে যোগাযোগ আছে এই কামরার। এই পথেই কি পালাল ওরা? ডুব দিয়ে?

আসবাবহীন ফাঁকা ঘরটার চওড়া দেয়াল আলমারিটা খুলেই চোখ পড়ল রানার একজোড়া অ্যাকুয়ালাঙের উপর। এগুলো কি সোনা তোলার জন্যে সংগ্রহ করা হয়েছে? নাকি প্রয়োজন হলে এই পথে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে?

হঠাৎ একটা উদ্ভট চিন্তা খেলে গেল রানার মাথায়।

দ্রুত তৈরি হলো ও। রাবার স্যুট চমৎকার ফিট করল ওকে। পায়ে ফ্লিপার বেঁধে নিয়ে নেমে গেল রানা সিঁড়ি বেয়ে। প্রতিটা ধাপ টপকাবার সাথে সাথে ডুবছে ও। বুক পানিতে নেমে অক্সিজেন টেনে নেয়ার মাউথ পিসটা দাঁতে কামড়ে ধরল।

আর দু'ধাপ নামতেই পানির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল রানা।

দু'পাশের দেয়াল বেশ অনেকদূর পর্যন্ত নেমে গেছে পানির নিচে। সামনে কোন দেয়াল নেই। কয়েক গজ এগিয়েই স্রোতের টান অনুভব করল সে। গঙ্গা।

পানির নিচ দিয়ে তীর ঘেঁষে ডানদিকে এগোল রানা। আরেকটা কামরা যদি থাকে, সেটা ডানদিকে হওয়ারই সম্ভাবনা। কিছু না পেলে আবার বামে চেষ্টা করা যাবে। নিকষ কালো অন্ধকারে কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না।

ঠিক তাই। হাত দুটো সামনে বাড়িয়ে না রাখলে দেয়ালে গিয়ে ঠোকর খেত রানার মাথা। গজ বিশেক এগিয়েই দেয়াল পেয়ে গেল সে। দেয়াল ধরে ধরে খানিকটা বাঁয়ে সরতেই পাওয়া গেল গোপন পথ, সিঁড়ির ধাপ।

কয়েক পা এগিয়ে অতি সাবধানে মাথা উঁচু করল রানা। পানির উপর আরও চোদ্দ-পনেরো ধাপ সিঁড়ি। তারপর আলোকিত একটা ঘর। পা টিপে উপরে উঠে এল রানা। কেউ নেই ঘরে। এ ঘরেও একটা দেয়াল আলমারি। ডানদিকে দরজা দেখা যাচ্ছে।

অ্যাকুয়ালাঙ খুলে রেখে দিল রানা আলমারিতে। পিস্তলটা বের করে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। এই দরজায় চাবি দেয়া নেই—সামান্য ঠেলা দিতেই খুলে গেল কপাট। সামনে আলোকিত সরু পথ। কয়েক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াল রানা। বামপাশে খোলা একটা দরজা। এক সেকেন্ডে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে লাফ দিয়ে গিয়ে দাঁড়াল চৌকাঠের উপর। পিস্তল তৈরি।

একটা চেয়ারের সাথে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বসে রয়েছে সেলিনা। এলোমেলো চুল। রানাকে দেখে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল ওর আয়ত চোখ। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা। ভাগ্যিস সেলিনার মুখটাও বেঁধেছিল ওরা! নইলে চেঁচিয়ে উঠত এখুনি।

দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল রানা। সেলিনার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আর কোন ভয় নেই, সেলিনা। চিৎকার করলে বিপদে পড়ব দু'জনেই।'

মাথা একপাশে হেলিয়ে সায় দিল সেলিনা। চটপট হাত-পা-মুখের বাঁধন খুলে দিল রানা এবার।

'তোমার অ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে…'

'জানি ওসব। কোথায় ওরা?'

'চলে গেছে। একজন লোক শুধু আছে, বাকি সবাই চলে গেছে। এই লোকটা আমাকে এখানে নিয়ে এসে বেঁধে রেখেছে। নক্সা আর টাকা কেড়ে নিয়েছে।'

'নক্সা নিল কি করে? কেউ খুঁজে পাবে না এমন জায়গায় রেখেছিলে না?'

'অবাক ব্যাপার, রানা। লোকটা একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না কোথায় রেখেছি। এক টানে আমার খোঁপা খুলে ফল্‌স্ চুলের বলের মধ্যে থেকে বের করে নিল নক্সাটা। হেসে উঠল, কিন্তু কোন রকম ভাবান্তর হলো না মুখের চেহারায়।'

নটরাজ! অনায়াসে চিনল রানা ওকে।

'আর কে আছে ওর সাথে?'

'আর কেউ নেই।'

'কোথায় ও? কোন্ ঘরে?'

'তা জানি না। দরজা দিয়ে বেরিয়ে ওই ওদিকে গেছে।'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'এখানেই থাকো তুমি। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কেমন?'

চট্ করে রানার একটা হাত ধরে ফেলে কি যেন বলতে যাচ্ছিল সেলিনা, কিন্তু বলল না। মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে ছেড়ে দিল হাতটা।

সরু প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেল রানা। মোড় ঘুরে পথটা শেষ হয়েছে একটা দরজার সামনে। এই ঘরেই পাওয়া যাবে নটরাজকে। দীপালিকেও কি এখানেই পাওয়া যাবে?

দরজার গায়ে কান ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা। ঘরের ভিতর কথাবার্তার শব্দ। একাধিক লোক আছে। বাঁ হাত দিয়ে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল কপাট।

চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো ঘরের ভিতর। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে নটরাজ প্রকাণ্ড এক ওয়াল ম্যাপের সামনে। টেলিফোনে কথা বলছে কারও সাথে। আর কেউ নেই। দরজার কাছে শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে দেখে অবিশ্বাস ফুটে উঠল ওর চোখে।

কামরার ভিতর পা বাড়াল রানা, 'ঘুরে দাঁড়াও, নটরাজ।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। দু'চোখে ভয়, মুখটা নির্বিকার।

ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে দেখে নিল রানা। বড়সড় ঘরটায় প্রচুর জিনিস। কয়েকটা আলমারিতে বই ঠাসা। এক কোণে এগারো ব্যান্ডের রেডিয়ো বসানো রেডিয়োগ্রাম। তাছাড়া রেফ্রিজারেটর, বড় একটা সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একটা রিভলভিং চেয়ার, টেলিফোন, ইন্টারকম এবং একধারে একটা ডিভান দেখা যাচ্ছে। বোঝা গেল এটাই নটরাজের অফিস-কাম-স্টাডি-কাম-বেডরুম।

'বাহাদুর লোক তুমি, স্বীকার করছি।' বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠেছে নটরাজ। 'পুলিস কি তোমার সাথে যুদ্ধে হেরে গেল? এই আস্তানায় ঢোকার একমাত্র পথটা খুঁজে পেলে কি করে?'

রানা বলল, 'প্রশ্ন করব আমি।'

শ্রাগ করল নটরাজ। 'ও. কে.। পিস্তলটা যতক্ষণ হাতে আছে, ইউ আর দ্য বস্।'

'কিভাবে তৈরি করলে তুমি নকল ম্যাপ?'

'কল্পনার সাহায্যে।'

'অসম্ভব! শুধু কল্পনা হলে ওগুলো আসল ম্যাপের সাথে এতটা মিলত না। নিশ্চয়ই আসল ম্যাপটা দেখেছ তুমি কোথাও।'

'তা ঠিক। তা না হলে নকল তৈরি করা সম্ভব হত না।' হাসছে নটরাজ। আপাদমস্তক দেখল রানাকে। 'কিন্তু তুমি কি করে জানলে ওগুলো নকল? ঠাকুরের বাড়িতে আমাকে চমকে দিয়েছিলে একেবারে। সেলিনার কাছে প্রথম অংশটা দেখেছ বুঝতে পারছি, কিন্তু শেষের অংশটা যে ভুল সেটা বুঝলে কি করে? রাশেদের ছদ্মবেশে কে তুমি?'

'আমি ছদ্মবেশে আছি কে বলল তোমাকে?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'আমার মন।'

'তুমি কে?' এবার সরাসরি জিজ্ঞেস করল রানা। 'তোমার এই কামরা দেখে মনে হচ্ছে এটাই তোমার জগৎ। গোপন আস্তানা ছেড়ে খুব একটা বেরোও না। রবারের মুখোশ ব্যবহার করছ আত্ম-পরিচয় গোপন রাখতে। কেন? কে তুমি?'

শব্দ করে হাসল নটরাজ। 'সত্যি কাউকে আমি আমার চেহারা দেখাতে চাই না। খুব কম বেরোই। কখনও সখনও, তাও গভীর রাত ছাড়া নয়। কেন জানো?'

'কেন?'

'ভয়ে।'

'কিসের ভয়ে? দাগী আসামী তুমি?' নটরাজের হাত নড়ে উঠতেই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা, 'সিগারেট খেতে পারো, নটরাজ, কিন্তু একটু এদিক ওদিক দেখলেই গুলি করব আমি। মানুষ খুন করে অভ্যেস আছে আমার—হাত কাঁপবে না।'

'সেটা তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারছি।' সিগারেট ধরাল নটরাজ। 'যা বলছিলাম, ভয়ে না, দাগী আসামী আমি নই। কেউ দেখে ফেলবে, চিনে ফেলবে, এই ভয়ে। চিনে ফেললেই আসামীতে পরিণত হব। তাহলে আমার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে। এতদিন ধরে যে আশায় বুক বেঁধে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছি, সে-সুযোগ এসে হাজির হয়েছে আমার সামনে। সব ব্যবস্থা সারা। এক হপ্তার মধ্যে কোটিপতি হয়ে যাচ্ছি আমি। সমস্ত সোনা ইয়টে তুলে নিয়ে নিরুদ্দেশে পাড়ি দেয়াটাই শুধু বাকি।'

'আরও একটা কাজ বাকি আছে,' বলল রানা। 'আমার হাত থেকে বেঁচে যাওয়া। যাই হোক, সে-প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে। আগে শুনি কে তুমি?'

'কে আমি?' হঠাৎ পাগলের মত হেসে উঠল নটরাজ। মাথার পিছনে চুলে হাত রাখল। মুখোশের প্রান্ত ধরে হ্যাঁচকা টান মারতেই খুলে গেল সেটা। 'আমি ভূত।'

চমকে উঠল রানা ভূত দেখে।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! হাসির দমকে দুলে দুলে উঠছে নটরাজের সারা শরীর।

হুবহু একই চেহারা! ঠিক যেন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা!

'রাশেদ!'

'হ্যাঁ, আমি বেঁচে আছি,' রাশেদ বলল। 'সবাই জানে আমি ছুটি কাটিয়ে যুদ্ধে যোগ দেবার পর পাঞ্জাবী সেনাদের অ্যামবুশের শিকার হয়ে অক্কালাভ করেছি। কিন্তু তা সত্যি নয়। কিভাবে বাঁচলাম? সে অনেক কথা। আজ থাক। বেঁচে আছি অথচ সবাই ধারণা করে নেবে আমি মরে গেছি এরকম একটা পরিস্থিতি দেখে সুযোগটা গ্রহণ করলাম আমি। চলে এলাম কোলকাতায়। মুখোশ নিলাম। নকল একটা ম্যাপ বিক্রি করলাম ঠাকুরের কাছে। বছরখানেক হয় কোলকাতায় বদলি হয়ে এল কাংকারিয়া—ওর কাছে বিক্রি করলাম আরেকটা। তারপর ভিড়ে গেলাম ওদের দলে আমিও একটা ম্যাপ কিনেছি—এই বলে। ম্যাপ মিলিয়ে দেখে রাজি হলো ওরা আমাকে দলে নিতে। প্রস্তুতিপর্বটা সেরেছি আমি ওদের ঘাড়ে চড়ে। শেষকালে দু'জনকেই কাঁচকলা দেখিয়ে কেটে পড়ব আমি।'

'লেফটেন্যান্ট আহসানকে তুমিই মেরেছিলে তাহলে?'

'উপায় ছিল না। মেজর বাশারের ক্যাম্প পুড়িয়ে দিয়েছিলাম, সে-ও শুধু ওই ম্যাপটা নষ্ট করে দেয়ার জন্যে। ওটা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আমিই হলাম সমস্ত সোনার একমাত্র মালিক।'

'ছোট্ট একটা ভুল হয়েছিল তোমার,' বলল রানা। 'মেজর বাশারের তাঁবুটা জ্বালিয়ে দিয়েছিলে ঠিকই, কিন্তু পরদিন পোড়া ম্যাপের অর্ধেকটা পাওয়া গিয়েছিল ভস্মস্তূপের মধ্যে। তুমি তখন কোলকাতার পথে রওনা হয়ে যাওয়ায় আর জানতে পারোনি সে-খবর। শেষের অর্ধেক ম্যাপ কোথায় দেখেছি জানতে চেয়েছিলে তুমি একটু আগে—ঠিকানাটা হচ্ছে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের হেড অফিস—ঢাকা।'

দপ্ করে নিভে গেল যেন রাশেদ। কুঁচকে গেল ভ্রূ-জোড়া। দ্রুত চিন্তা করছে সে। খানিক চুপ করে থেকে নিচু গলায় বলল, 'বুঝলাম কেন তোমার সাথে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারেনি কোলকাতার পুলিস। তুমি চোপরার বাবা—বাংলাদেশের স্পাই। কিন্তু অর্ধেক ম্যাপ থাকলেও কোন লাভ হচ্ছে না তোমাদের। প্রথম অর্ধেকটা ছিল সেলিনার কাছে। ওটা এখন আমার দখলে।'

'ওর খোঁপার মধ্যেই যে ওটা আছে জানলে কি করে?'

'ভুলে যেয়ো না, ছেলে-বেলা থেকে একসাথে মানুষ হয়েছি আমরা,' গলার স্বর আরও একটু খাদে নামাল রাশেদ। 'ছোটখাট জিনিস লুকোতে হলে কোথায় রাখবে ও আমার জানা আছে।'

'গত তিন বছরে ম্যাপটা ওর কাছ থেকে সংগ্রহ করবার চেষ্টা করোনি কেন?'

'প্রয়োজন ছিল না। প্রত্যক্ষদর্শী আমি। আমি নিজেই যখন সোনা তুলব, প্রথম অংশ আমার না হলেও চলবে। জায়গা তো চেনাই আছে।'

'সেলিনাকে নিজের পরিচয় দাওনি কেন?'

'ওকে মেরে ফেলব,' বলল রাশেদ। 'কৈশোর এবং যৌবনের সন্ধিক্ষণে শারীরিকসুখ পেয়েছিলাম ওর কাছ থেকে। কিন্তু সেজন্যে কৃতজ্ঞতা বোধ করিনি কোনদিন। কিন্তু ও হাবুডুবু খেয়েছে আমার প্রেমে। কি দরকার পরিচয় দিয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ কান্নার ঝামেলার মধ্যে গিয়ে? ওকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।'

'যেভাবে কথা বলছ, তাতে মনে হচ্ছে আমি তোমার দিকে নয়, তুমিই আমার দিকে পিস্তল ধরে আছ। তোমার বিশ্বাস, উদ্ধার পেয়ে যাবে, সাহায্য আসবে বাইরে থেকে...'

'না। বাইরে থেকে এখানে ঢোকার ওই একটাই মাত্র পথ—আর কারও জানা নেই কিভাবে পৌছতে হবে এখানে। আমি আত্মবিশ্বাসী লোক। কথা আমি ওইভাবেই বলি। পরাজয় কাকে বলে জানা নেই আমার। কারও সাহায্যের প্রত্যাশায় বসে থাকা আমার স্বভাব নয়। আমি জানি যে কোন বিপদ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতা আমার আছে। বিপদ কেটে গেলেই যা বলছি তাই করে ছাড়ব।'

সত্যিই আত্মপ্রত্যয় দেখতে পেল রানা লোকটার চোখে। একগুঁয়ে ভয়ঙ্কর লোক।

'ম্যাপটা পুতুলের ভেতরে করে সেলিনার কাছে পাঠিয়েছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা

'নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে। ভুলে যেতে পারি সে ভয় ছিল—তাই অর্ধেকটা পাঠিয়েছিলাম সেলিনার কাছে, বাকি অর্ধেক রেখেছিলাম আরেকটা পুতুলের মধ্যে কোলকাতারই এক মেয়ের কাছে।'

'কোথায় সে? কে সে মেয়ে?'

'আমার বর্তমান স্ত্রী।'

'নাম?'

'নাম দিয়ে কি হবে? চাক্ষুষ দেখতে পাবে খানিক বাদেই। বুলবুলি বলে ডাকি আমি তাকে।'

'তোমার বুলবুলি যে বর্তমানে কাংকারিয়ার খাঁচায় বাস করছে, সে খবর রাখো?'

চট্ করে রানার মুখের দিকে চাইল রাশেদ। 'অসম্ভব!' একটু ভেবে বলল, 'না। ভুল বললাম। হতেও পারে। কিন্তু...তুমি জানলে কি করে?'

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে টের পেল রানা, সেলিনা ঢুকল ঘরে। হঠাৎ চোখ দিয়ে সেলিনাকে ইশারা করল রাশেদ।

'রানা! আমি আগেই বারণ করতে চেয়েছিলাম...' প্রায় ককিয়ে উঠল সেলিনা। পরমুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে রানার উপর রাশেদের ইঙ্গিতে। পিছন থেকে জাপটে ধরল দু'হাতে।

কি ঘটছে, কেন ঘটছে বুঝতে পারল রানা, কিন্তু বোঝাবার সময় পেল না। আসলে দু'জনের পরনেই সাদা শার্ট-প্যান্ট। তাই রাশেদকে রানা মনে করেছে সেলিনা। মনে করেছে পিস্তল হাতে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকা

লোকটা নটরাজ—কোন কৌশলে রানার হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নিয়েছে। এটা মনে করাই স্বাভাবিক। সেই সুযোগটা নিয়েছে রাশেদ। পিছন থেকে পিস্তল ধরা হাতসহ রানাকে জাপটে ধরে রাশেদের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠল সেলিনা, 'রানা! কেড়ে নাও পিস্তল! জলদি! ধরে রাখতে পারছি না!'

গা ঝাড়া দিয়েও সরাতে পারল না রানা সেলিনাকে। এক হাতে চুল ধরে টানছে পিছন দিকে, ফোঁপাচ্ছে ভয়ে। আরেক হাতে ধরে রেখেছে রানার ডান হাতের কব্জি।

'ড্রপ দ্যাট গান!' গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ করল রাশেদ।

অবস্থা রানার আয়ত্তে এসে গেছে মনে করে ছেড়ে দিল সেলিনা শত্রুকে।

সামনে চেয়ে দেখল রানা, রাশেদের হাতে শোভা পাচ্ছে একটা কোল্ট অটোমেটিক। সোজা ওর বুকের দিকে তাক করে ধরা। ট্রিগারের উপর চেপে বসছে তর্জনী।

হাত থেকে পিস্তলটা ছেড়ে দিল রানা। ওটা মেঝে থেকে তুলে নিতে যাচ্ছিল সেলিনা, থমকে গেল প্রচণ্ড এক ধমক খেয়ে।

'খবরদার! পিস্তল ছুঁলেই গুলি খাবে, সেলিনা! সোজা হয়ে দাঁড়াও!'

সোজা হয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে চাইল সেলিনা রাশেদের মুখের দিকে, তারপর রানার মুখের দিকে চেয়েই আঁৎকে উঠল ভয়ানক ভাবে।

হা-হা করে হেসে উঠল রাশেদ।

'সেইম-সাইড হয়ে গেছে, সেলিনা। ভুল করে আমার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।' রানার দিকে চাইল। 'এই সুযোগটারই অপেক্ষা করছিলাম আমি, মিস্টার রানা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দরজার ওপাশে দেয়ালের গায়ে সেলিনার ছায়া দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি জানতাম ঘরে ঢুকবে ও, এবং ঢুকেই ভুল করবে আমাকে তুমি মনে করে। সামান্য একটু চোখের ইশারায় যে লোক হারা গেম জিতে নেয়ার ক্ষমতা রাখে তাকে হারাবে কি করে, জনাব?'

রাশেদের দিকে একবার, রানার দিকে একবার—বার কয়েক চাইল সেলিনা। বিস্ফারিত দুই চোখ। দুই চোখের দৃষ্টিতে অবিশ্বাস।

রাশেদ হাসছে, 'কি হলো, সেলিনা? হাঁ করে দেখছ কি? আমি রাশেদ। তুমি যাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলে, আমি তোমার সেই প্রেমিক রাশেদ। আদর্শ প্রেমিকার কাজই করেছ তুমি।'

'তুমি রাশেদ!'

'হ্যাঁ। আমি মরিনি।' হাসছে রাশেদ, 'সহজে মরণ নেই আমার। মরতে মরতেও বেঁচে উঠি আবার। কিন্তু তোমার এই নতুন বন্ধুটিও বড় ভয়ঙ্কর। আমার মতই এর মরতে মরতেও বেঁচে ওঠার অভ্যেস আছে। তাই দেরি করতে চাই না। তৈরি হয়ে যাও। দু'জনই। বিদায় সম্ভাষণ যদি কিছু থাকে, জানিয়ে দাও অল্প কথায়। অবশ্য বেশিক্ষণ নয়, মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যে ছাড়াছাড়ি হবে দু'জনের—তারপরই দেখা হবে আবার পরপারে।'

রানার দিকে ফিরল সেলিনা। 'আমি বুঝতে পারিনি, রানা···ভুল করে···'

প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেয়ে দশ হাত তফাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেলিনা। ওকে ধাক্কা দিয়েই চোখের নিমেষে বাম হাতের কব্জি থেকে রোলেক্স অটোমেটিক ঘড়িটা খুলে নিয়েছে রানা। লাফ দিয়ে উল্টো দিকে সরে যেতে যেতে সাঁই করে ছুঁড়ল সে ঘড়ি।

ব্যাপারটা এতই আচমকা এবং এতই বিদ্যুৎবেগে ঘটে গেল যে দু'জনের মধ্যে কার উপর লক্ষ্য স্থির রাখবে, কাকে আগে গুলি করবে বুঝে উঠতে না পেরে এক সেকেন্ডের জন্যে থতমত খেয়ে গেল রাশেদ। উজ্জ্বল আলোয় ঝিক করে উঠল সোনালী চেন, পরমুহূর্তে ধাঁই করে ভারী ঘড়িটা গিয়ে লাগল রাশেদের নাকের উপর। ডাইভ দিল রানা মেঝের উপর পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে।

গুলি করল রাশেদ। নাকের উপর বেমক্কা আঘাত খেয়ে দরদর করে পানি বেরিয়ে এসেছে ওর চোখ থেকে। ঝাপসা দেখছে বলে লক্ষ্যভেদ করতে পারল না গুলিটা, ডাইভরত রানার এক হাত উপর দিয়ে গিয়ে দরজায় বিঁধল।

পিস্তলটা তুলে নিয়েই এক গড়ান দিয়ে সরে গেল রানা। আবার গুলি করল রাশেদ। এবার রানার মাথা থেকে তিন ইঞ্চি তফাতে এক খাবলা কার্পেট তুলে নিয়ে দেয়ালে গিয়ে লাগল গুলি।

গড়াতে গড়াতেই গুলি করল রানা। কোন রকম ঝুঁকি নিল না সে।

পিছন দিকে বাঁকা হয়ে গেল রাশেদ। চোখ-মুখ কুঁচকে দাঁত বের করে ফেলেছে সে মৃত্যু যন্ত্রণায়। রানার উদ্দেশে ছোঁড়া ওর তৃতীয় গুলিটা সোজা ছাতে গিয়ে লাগল, থেঁতলে চ্যাপ্টা হয়ে টুপ করে পড়ল ওর পায়ের কাছে।

ধড়াস করে মেঝের উপর আছড়ে পড়ল রাশেদের নিষ্প্রাণ দেহ। বুক দিয়ে ঢুকে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে পয়েন্ট থ্রী-টু বুলেট। ওয়াল ম্যাপে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য লাল রক্তের ছিটেফোঁটা দাগ।

উঠে দাঁড়িয়েছে সেলিনা। অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে রাশেদের দিকে। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে স্বীকার করে নিয়েছিল সে। রাশেদের কথামত শেষ বিদায় নিচ্ছিল রানার কাছ থেকে—হঠাৎ যে এমন আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে যাবে, ঘটে গেছে, সেটা বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না কিছুতেই। যখন পরিষ্কার বুঝতে পারল, আতঙ্কের ঘোরটা কাটিয়ে উঠে নিশ্চিত হলো, তখন বেঁচে থাকার আনন্দে কেঁদে উঠল হঠাৎ। ঝাঁপিয়ে পড়ল রানার বুকে।

পিঠে হাত বুলিয়ে শান্ত করল রানা ওকে। কান্না থামতেই টেনে নিয়ে গেল দরজার কাছে।

'কথা না শোনায় কত বড় বিপদ ডেকে এনেছিলে বুঝতে পারছ?'

অপরাধীর মত চোখ নিচু করে মাথা ঝাঁকাল সেলিনা।

'কাজেই এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত যেখানে বসে থাকতে বলেছিলাম সেখানে গিয়ে বসে থাকো। আমার কাজ শেষ হয়নি এখনও। আমি না ডাকলে আসবে না আর এ ঘরে। কেমন?'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল সেলিনা।

দ্রুত কাজ সেরে এখান থেকে বেরিয়ে পড়ার তাগিদ অনুভব করল রানা। ঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখল ঠিক দশটা পঁয়ত্রিশে বন্ধ হয়ে গেছে ওটা। পৌনে এগারোটার বেশি হবে না এখন।

নিশ্চয়ই এই গোপন আস্তানা থেকে বেরুবার আরও পথ আছে। পিস্তলটা হোলস্টারে ভরে চারদিক তাকাল রানা। রাশেদ বলেছিল ওই নদীপথ ছাড়া ওর আস্তানায় ঢোকার আর কোন পথ নেই। কথাটা মিথ্যে হতে পারে। সত্যিও যদি হয়, তার মানে এই নয় যে এখান থেকে বেরোবার পথও ওই একটিই। প্রয়োজনে খুব দ্রুত আর সহজে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এক বা একাধিক গুপ্ত পথ থাকাই স্বাভাবিক।

চারদিক দেখে দেয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড ওয়াল-ম্যাপটাই পছন্দ হলো রানার।

ওয়াল-ম্যাপের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। বেশিক্ষণ খুঁজতে হলো না। ম্যাপের মাঝামাঝি জায়গায় পাশাপাশি ছোট্ট দুটো বোতাম দেখতে পেল ও। বাঁ পাশের বোতামটায় চাপ দিতেই শব্দ ভেসে এল কামরার বাঁ দিকের দেয়াল থেকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দেয়ালে বসানো ক্যাবিনেটের দরজাটা খুলে যাচ্ছে।

এগিয়ে গেল রানা। অনেকগুলো টাকার বান্ডিল। ঠাকুরের পাঠানো অ্যাটাচী কেসটাও রয়েছে একপাশে। ছোট্ট একটা আয়রন সেফ দেখতে পেল রানা। খোলা গেল না। চাবি দেয়া।

চাবি পাওয়া গেল রাশেদের পকেটে।

আয়রন সেফে পুরু কাগজে তৈরি একটা এনভেলাপ ছাড়া আর কিছুই নেই। ভিতরের কাগজগুলো বের করেই হাসি ফুটে উঠল রানার ঠোঁটে। প্রথম বেরোল সেলিনার কাছে পাঠানো নক্সাটা, তারপরেই রয়েছে ঠিক একই সমান আরেকটা টুকরো। টেবিলের উপর দুটো টুকরো পাশাপাশি বিছিয়ে কান পর্যন্ত পৌঁছল রানার হাসি। খাঁজে খাঁজে মিলে যাচ্ছে প্রথম অংশের সাথে দ্বিতীয় অংশের ছেঁড়া দাগ। কোন সন্দেহ নেই যে এটাই আসল ম্যাপ। দুটো মিলে সম্পূর্ণ।

পুরো ম্যাপের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভাঁজ করে খুব ছোট করে ফেলল রানা। তারপর ঢুকিয়ে দিল হাইহিল জুতোর গোড়ালিতে বিশেষভাবে তৈরি ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে। আয়রন সেফে চাবি লাগিয়ে কেবিনেটের ডালা দুটো চেপে দিতেই ক্লিক করে আটকে গেল সেটা। চাবিটা ঢুকিয়ে দিল রাশেদের পকেটে। এসে দাঁড়াল ওয়াল-ম্যাপের সামনে।

ডানদিকের বোতামে চাপ দিতেই বোতামের কাছাকাছি একটা ফাটল সৃষ্টি হলো ওয়াল-ম্যাপে।

দু'ভাগ হয়ে যাচ্ছে ম্যাপটা। চারকোনা একটা ফাঁক তৈরি হলো দরজার সামনে।

থমকে দাঁড়াল রানা ফাঁকটার সামনে।

ওপাশে পিস্তল হাতে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে দীপালি। রানা নড়ে

উঠতেই গুলি করল দীপালি। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল গুলিটা।

'এটা ওয়ার্নিং। কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটা ঠিক জায়গা মতই ঢুকবে, মিস্টার স্পাই।'

ঘরে ঢুকল দীপালি। ওর পিছন পিছন একগাল হাসি মুখে নিয়ে ঢুকল রামরাম কাংকারিয়া। তার পিছনে পর্বত-প্রমাণ সার্জেন্ট চোপরা। তিনজনের হাতের পিস্তলই লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে রানার বুকের ভিতর ধুকপুক-রত হৃৎপিণ্ডের দিকে। ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে দ্বিগুণ বেগে ধুকপুক শুরু করল হৃৎপিণ্ডটা।

রানাকে বোকা বনে যেতে দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল দীপালি।

'খুব অবাক লাগছে, গুরুদেব?'

'যতটা ভাবছ ততটা নয়, বুলবুলি!' হাসল রানা।

'মাগো মা!' কৌতুকে চোখ বড় করল দীপালি। 'কখন টের পেলেন?'

'এই নামটা জেনেছি অল্প খানিক আগে, রাশেদের কাছে। কিন্তু তোমাকে চিনেছি আমি পরিচয়ের দ্বিতীয় দিনেই।'

'কি করে?'

'ঈগার বিভারকে সন্দেহ করাই তো স্বাভাবিক। তোমার আগ্রহের আতিশয্য দেখে ফিরপোজ রেস্তোরাঁয় দেখিয়েছিলাম তোমাকে পুতুলটা। ওর ভিতরটা যে ফাঁকা, সেটা জানা ছিল না বলেই ধরা পড়ে গেলে তুমি। ফোন করলে কাংকারিয়ার কাছে। তোমার অ্যাপার্টমেন্টে আবার তোমার হাতে দিলাম আমি পুতুলটা। সত্যিই পরীক্ষা নিয়েছিলাম আমি সেদিন। কায়দা করে পুতুলের মাথাটা খুলে ভেতরটা দেখে নিলে তুমি। আমিও লাইনের লোক পেয়ে গুরু বনে গেলাম তোমার। ম্যাপ বিক্রির কথাটা পাড়লাম। সাহায্যের অনুরোধ জানিয়ে বেরিয়ে এলাম তোমার ওখান থেকে। কিন্তু তখন আর সময় ছিল না গর্দভ চোপরাকে ফেরাবার। মুচিপাড়া থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে পুতুল না পেয়ে মারধর করে ছেড়ে দেয়া হলো আমাকে। চিনে ফেললাম আমি তোমাকে।' হাসল রানা। 'তোমার যে পুলিসের সাথে লাইন আছে সেটা পরিষ্কার হয়ে গেল আরও একটা ব্যাপারে। তোমার বন্ধু প্রশান্ত কারনান হোটেলে...'

মন দিয়ে রানার কথা শুনছিল দীপালি, চমকে উঠল কাংকারিয়ার ধমক শুনে।

'চোপরাও!' ধমকে উঠল কাংকারিয়া রানার দিকে চেয়ে। দীপালিকে চমকে উঠতে দেখে একটু নরম গলায় বলল, 'বাজে গল্প বলে সময় নষ্ট করছে লোকটা, বুঝতে পারছ না?' রানার দিকে চাইল কটমট করে। 'ম্যাপটা কোথায়?'

'আমিও খুঁজছি ওটা। কোথায়?'

'বুলেট একটা ঢুকিয়ে দিই, স্যার!' বলল চোপরা। 'তারপর সার্চ করলেই বেরিয়ে যাবে।'

'আগে সার্চ করে তারপর বুলেট ঢোকাও, হাঁদারাম!' বলল কাংকারিয়া।

'প্রয়োজন হলে কথা বলাতে হবে ওকে দিয়ে।' দীপালির দিকে ফিরল। 'আমি একে কাভার করছি, তুমি যাও, মেয়েলোকটাকে নিয়ে এসো এ ঘরে।'

পিস্তল হাতে সতর্ক পায়ে বেরিয়ে গেল দীপালি। রানার পিছনে গিয়ে দাঁড়াল কাংকারিয়া। তন্নতন্ন করে সার্চ করল চোপরা রানাকে, বার বার তিন বার—পিস্তলটা পাওয়া গেল, কিন্তু নক্সা পেল না।

'কোথায় রেখেছিস ওটা?' চটাস করে চড় কষাল চোপরা রানার গালে।

হুড়মুড় করে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল রানা প্রচণ্ড চড় খেয়ে। দেয়ালে পা বাধিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল চোপরার উপর, কিন্তু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল কাংকারিয়ার গর্জন শুনে।

'ডোন্ট মুভ!'

ভীত-চকিত দৃষ্টিতে চারদিকে চাইতে চাইতে ঘরে ঢুকল সেলিনা। রানার দিকে একনজর চেয়েই বুঝতে পারল, উল্টে গেছে পাশার ছক। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল ওর চেহারা।

'ম্যাপটা পাওয়া গেল না এর কাছে,' দীপালির উদ্দেশে বলল কাংকারিয়া।

'ডোন্ট ওয়ারি, ডার্লিং!' সেলিনার চুল ধরে হ্যাঁচকা একটা টান মেরে ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দিল দীপালি রানার দিকে। 'পাঁচ মিনিটেই বেরিয়ে যাবে।'

ওয়াল ম্যাপের বাম দিকের বোতাম টিপল দীপালি। খুলে গেল ওয়াল-ক্যাবিনেট। চোপরা ও কাংকারিয়াকে অবাক হয়ে ওইদিকে চাইতে দেখে অন্যমনস্কতার সুযোগ নিতে যাচ্ছিল রানা, দীপালির উপর চোখ পড়তেই থেমে গেল। ট্রিগারের উপর চেপে বসছে ওর তর্জনী।

রানাকে শরীরের পেশীগুলো শিথিল করতে দেখে হাসল।

'সাবধান, মিস্টার স্পাই! আপনি ভয়ঙ্কর লোক, সন্দেহ নেই, কিন্তু আমরাও ভয়ঙ্কর। এবং বেপরোয়া!'

দীপালির চোখের দিকে চেয়ে বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার—কথাটা মিথ্যে নয়।

কাংকারিয়া ও চোপরাকে রানা আর সেলিনার দিকে মনোযোগী হতে দেখে পা দিয়ে চিৎ করল দীপালি রাশেদের লাশ, ডান-বাঁ বুঝে নিয়ে বাম পকেট থেকে চাবিটা বের করে নিল। খোলা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে আয়রন সেফে চাবি ঘুরাল দীপালি, খাম বের করে ভিতরটা একনজর দেখেই আড়ষ্ট হয়ে গেল ওর শরীর। রানার চোখের দিকে চেয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল সামনে।

'কোথায় ম্যাপ?'

'খুঁজে পেলে আমাকে একনজর দেখিয়ো,' বলল রানা। 'যেটার জন্যে এতকিছু, সেটার ওপর একবার চোখ বুলাতে না পারলে মরেও শান্তি···'

'ধোকা দেয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না, মিস্টার স্পাই। কথা কিভাবে আদায় করতে হয় জানা আছে আমার। ভাল চান তো বলে ফেলুন।'

'রাশেদের বডি সার্চ করেছ?' প্রশ্ন করল রানা।

দীপালির ইঙ্গিতে তল্লাশি শুরু করল চোপরা। মৃতদেহটা উল্টেপাল্টে কোথাও বাকি রাখল না খুঁজতে। নিরাশ হয়ে চোপরাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে নিষ্ঠুর একটুকরো হাসি খেলে গেল দীপালির ঠোঁটে।

'আঙুল বাঁকা না করলে ঘি উঠবে না। চোপরা, এক এক করে ভাঙতে শুরু করো এই মেয়েটার আঙুল। দেখি কতক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারে।'

'না!' হাসিমুখে চোপরাকে এগিয়ে আসতে দেখে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল সেলিনা। রানার গায়ের সাথে সেঁটে মিশে যেতে চাইছে।

খপ্ করে চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টানে কয়েক পা পিছনে নিয়ে এল ওকে চোপরা। খপ্ করে ডান হাতের কব্জি ধরে বাঁকা করে নিয়ে এল পিছনে পিঠের কাছে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল সেলিনা।

'হয়েছে,' বলল দীপালি। 'এবার আমি এক, দুই, তিন বলার সাথে সাথে মটকে ভেঙে নেবে এক একটা আঙুল।' ফিরল রানার দিকে। 'কোথায় রেখেছ ম্যাপটা?'

'সেলিনার ওপর অত্যাচার করে আমার পেট থেকে কথা বের করতে পারবে না, দীপালি। রাশেদ হলে হয়তো সেটা সম্ভব ছিল। তার চেয়ে এসো একটা চুক্তিতে আসা যাক। ম্যাপটা যদি আমি তোমাদের দিই...'

'এক...দুই...'

সেলিনার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে দীপালির 'তিন' গণনা বা আঙুল ভাঙার 'কড়াৎ' শব্দ কানে গেল না রানার। লাফ দিয়ে শূন্যে উঠেই ফ্লাইং কিক মারল সে দীপালির বুকের উপর। কাংকারিয়ার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দীপালি। দু'জনের পিস্তলই একসাথে গর্জে উঠল লক্ষ্যহীনভাবে।

সেলিনাকে ছেড়ে দিয়েই রানার বুক লক্ষ্য করে রিভলভার তুলল চোপরা। অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিল সেলিনা ওকে। গুলিটা বুকে না লেগে কাঁধের এক খাবলা মাংস তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

একলাফে সরে গিয়ে আবার লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করল চোপরা। কিন্তু ততক্ষণে কাংকারিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা, পিস্তলটা কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করছে এক হাতে। মেঝের উপর এমনভাবে গড়াগড়ি খাচ্ছে দু'জনে যে গুলি করলে মারা পড়বে দু'জনই।

ইতোমধ্যে এক লাথি দিয়ে পিস্তল খসিয়ে দিয়েছে রানা দীপালির হাত থেকে। ওটা গিয়ে পড়ল সেলিনার পায়ের কাছে। রানা বারণ করবার আগেই ঝপ্ করে বসে বাম হাতে পিস্তলটা তুলে নিল সেলিনা।

সেলিনাকে পিস্তল তুলে নিতে দেখেই ঝট্ করে ওর দিকে ঘুরল চোপরার রিভলভার। কিন্তু ট্রিগারে চাপ দেয়ার আগেই কড় কড় করে গর্জে উঠল স্টেনগান। কামরার বাইরে থেকে।

দুই ঝাঁক গুলি ঝাঁঝরা করে দিল চোপরার বুক। ছিট্কে গিয়ে দেয়ালের

গায়ে আছড়ে পড়ল লোকটার বিশাল শরীর। সেখান থেকে মাটিতে। স্থির।

স্থির হয়ে গেছে কাংকারিয়াও। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে রয়েছে সে দেয়ালের গায়ে তৈরি ফাঁক দিয়ে বাইরে। ঘরে এসে ঢুকল দু'জন দুর্ধর্ষ যুবক। সুঠাম, ঋজু, পেটা শরীর। ঘরের চারপাশে একবার ঘুরে এসে রানার মুখের উপর স্থির হলো দু'জোড়া অকুতোভয় চোখ।

কাংকারিয়ার কাছ থেকে কেড়ে নেয়া পিস্তল হাতে উঠে দাঁড়াল রানা। রক্তে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে কাঁধের কাছে কোটটা। প্রায় ছুটে এসে কাছে দাঁড়াল দুই আগন্তুকের একজন।

'জখমটা মারাত্মক কিছু নয় তো, স্যার?'

'না। তবে ফার্স্ট এইড নিতে হবে। আমাদের দু'জনকেই। দেরি করলে কেন, ইসলাম?'

'তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পথে অ্যাক্সিডেন্ট করেছিলাম,' লজ্জিতকণ্ঠে বলল ইসলাম। সঙ্গীর সাথে রানার পরিচয় করিয়ে দিল, 'ইনি আর্মি ইন্টেলিজেন্সের ক্যাপ্টেন সমীর চট্টোপাধ্যায়। আর ইনি আমাদের কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মেজর মাসুদ রানা।'

পারস্পরিক 'গ্ল্যাড টু মিট ইউ'র পর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সে গাড়ির ব্যবস্থা করতে।

'আপনিই কাংকারিয়ার কেসটা ডিল করছিলেন?' জিজ্ঞেস করল রানা সমীরকে।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ। গত একটা বছর চোখে চোখে রেখেও দাঁত ফুটাতে পারছিলাম না ওর গায়ে। আপনার অনুমতি পেলে একে এবার তুলে নেয়ার ব্যবস্থা করি?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!' হাসল রানা। 'ওকে আমার আর কোন দরকার নেই।'

একটা হুইসেলে ফুঁ দিল সমীর চট্টোপাধ্যায়। রানার দিকে ফিরল, 'ভাল কথা, সুধীর রায়কে পিক-আপ করা হয়েছে। ও স্বীকার করেছে, ওর বোন দীপালি রায়কে জানিয়েছিল ও আপনার কথা। আসল রাশেদ গিয়ে খুন করে এসেছিল নকল রাশেদ মনে করে জিতেন বাবুকে।'

আধ ডজন আর্মি জোয়ান মার্চ করে এসে ঢুকল ঘরে। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল দীপালি আর কাংকারিয়াকে। মিলিটারি হাসপাতালে ফোন করছে ক্যাপ্টেন লাশ দুটোর ব্যাপারে।

সেলিনার আঙুলটা পরীক্ষা করে দেখল রানা। বেকায়দা রকম বাঁকা হয়ে রয়েছে।

'গাড়ি তৈরি, স্যার,' ঘরে ঢুকেই বলল ইসলাম। 'একেবারে ভেতরে নিয়ে এসেছি। হেঁটে যেতে পারবেন এটুকু, না...'

'পারব। তুমি এগোও, আসছি আমরা।'

'এখনও বেঁচে আছি আমরা!' গাড়িতে উঠে বলল সেলিনা, 'অবাক লাগছে

না?'

'কই, না!' বিস্ময়ের ভান করল রানা। 'মরব কেন? মরার তো প্রশ্নই ওঠে না। মনে নেই, কথা দিয়েছিলাম তোমাকে…ওয়ার্ড অভ অনার? মরে গেলেই বরং অবাক হতাম।'

হাসল সেলিনা। বলল, 'ভাগ্যিস আদেশ করেছিলাম!'

'তা ঠিক।' স্বীকার করল রানা অকপটে। 'নইলে কখন মরে ভূত হয়ে যেতাম!'

* * * *


High Quality Aohor Arsalan Scan
scan with
canon
Aohor Arsalan
ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION
Visit Us Now
WWW.BANGLAPDF.NET